অনীক

এপ্রিল ২০১৩
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ১০
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

সারদা গোষ্ঠীর প্রতারণা... ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ২
রাজ্যের নয়া নিয়োগবিধি ❑ সন্দীপ ❑ ৩
নন্দীগ্রামের পরে... ❑ সঞ্জীব আচার্য ❑ ৪
ঋণ আর লুঠের পাকচক্রে... ❑ প্রণব দে ❑ ৭

অন্যচোখে

কাসভ...সর্বজিৎ... আম্মি ❑ মালবিকা মিত্র ❑ ৩৭

শাহবাগ আন্দোলন

শাহবাগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও গতিপ্রকৃতি ❑ বদরুদ্দীন উমর ❑ ২৩
সাক্ষাৎকার : লাকি আকতার ❑ ২৯

প্রবন্ধ

চাভেজ ও লাতিন আমেরিকা... ❑ সুচরিতা সেন ❑ ১০
নোভার্টিস ও গ্লিভেক... ❑ প্রদীপ রায় ❑ ১৫
নতুন মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র : ড্রোন ❑ মিতা দত্ত ❑ ১৯
মহঃ আফজল ও কাশ্মীর... ❑ তাপস চক্রবর্তী ❑ ৩৩

কবিতা

সাম্প্রতিক ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ৩৬

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

দীপংকরকে মনে পড়ে ❑ মনিময় মুখোপাধ্যায় ❑ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

প্রতিবাদী কণ্ঠরোধের নতুন রাজনীতি

বঙ্গদেশে রঙ্গের অভাব নেই। পরিবর্তনের আগে বঙ্গবাসী অনেক রঙ্গের সাক্ষী। পরিবর্তনের পরেও সমানতালে রঙ্গদর্শী। সাম্প্রতিক তিনটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক এবং বিদগ্ধ মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে— কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে, ছাত্রদের রাজনীতির কলুষ মুক্ত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরা হলো, খিদিরপুরে হরিমোহন ঘোষ কলেজে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গুণ্ডামি এবং পরিণতিতে পুলিশকর্মী তাপস চৌধুরির মৃত্যু, ছাত্রদের আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার সুদীপ্ত গুপ্তের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু এবং দিল্লীতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে হেনস্থার প্রতিবাদে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভাঙচুর। এই সব ঘটনা জের টেনে তৃণমূল সরকার সমস্ত কলেজের নির্বাচন স্থগিত করে দেয়।

এই অবসরে মিডিয়া সমস্বরে একটা প্রচারে নেমেছে— 'শিক্ষার প্রাঙ্গণ হবে রাজনীতি-মুক্ত', 'ছাত্রদের অধ্যয়নের জগতে রাজনীতি ব্রাত্য'। সাধারণ গৃহবধূ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তনী— সবাইকে সামিল করানো হচ্ছে এই ভাবধারা প্রসারে। সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে, ক্যাম্পাস-হিংসা প্রতিরোধে এটাই একমাত্র পথ। এমনকি কলেজ স্ট্রীটে মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হচ্ছে। বর্তমান শাসক দলের উচ্চতম নেতৃত্ব প্রচ্ছন্নভাবে এই প্রচারে মদত দিয়ে যাচ্ছে। আর এই সবের পিছনে শুধুই ছাত্র-দরদ কাজ করছে নাকি বৃহত্তর কোন গূঢ় অভিসন্ধি কাজ করছে, সেটাই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই কথাটা বলছি কারণ সম্প্রতি মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারের বিরূপতা বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। তা সে বন্দীমুক্তি, নাগরিক স্বাধীনতা, শিক্ষক বা সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার, যাই হোক না কেন, প্রায় সব ক্ষেত্রে অর্জিত অধিকার সরকার অস্বীকার করেছে। এর মানে এই নয় যে, বামফ্রন্ট জমানায় বাক স্বাধীনতার অবাধ স্ফূর্তি ছিল। তখন দলগত শক্তিতে যা নিয়ন্ত্রণ করা হতো, এখন আমলাতন্ত্র ও পুলিশের মাধ্যমে এবং কখনও মস্তানদের সাহায্যে সেই একই ধারা বজায় রয়েছে। সুতরাং ছাত্রদের যদি দলে টানতে না পারা যায়, মুখটাই বন্ধ করে দাও।

কয়েক বছর আগে, ২০০৬ সালে লিংডো কমিটি ছাত্র সংগঠনের পদাধিকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির হস্তক্ষেপ বন্ধ করার সুপারিশ করেছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের গণ-সংগঠনগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নেবে কিনা বা গণ-সংগঠনগুলিকে স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হওয়ার অধিকার দেবে কিনা, সে ব্যাপারে গভীর সংশয় আছে। কিন্তু এই কমিটিকে সামনে রেখেই অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের ধুয়া তোলা হচ্ছে। এটা ঘটনা, বর্তমানে আমাদের দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে সমাজ-অভিমুখী মূল্যবোধের স্থান বিরল। স্বার্থান্বেষী, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদরাই সংসদ/বিধানসভা আলো করে থাকেন। এই রাজনীতি যদি ছাত্ররা পরিহার করে চলে বা বিরোধিতা করে, তাহলে তাকে স্বাগত জানানোই যায়। কিন্তু শাসক শ্রেণী আসলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিরোধী কণ্ঠটাকেই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বার্তাটাকেই চেপে ধরতে চায়। আর শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে বেসরকারিকরণের প্রবণতা বাড়ছে, তাতে কর্পোরেট স্বার্থ পূরণে এই কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা, অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, দেশে দেশে কালে কালে ছাত্র আন্দোলন বার বার এসেছে প্রকৃত পরিবর্তনের দূত হয়ে। চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে এদেশের খাদ্য-আন্দোলন, অকুপাই মুভমেন্ট থেকে শাহবাগ আন্দোলন— এসব আন্দোলনের মূল শক্তি ছাত্র-যুবরাই। শাসকশ্রেণী চাইছে এই আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে। ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করার পেছনে আছে এই গভীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি।

সারদা গোষ্ঠীর প্রতারণা ব্যবসা : তৃণমূল ও সিপিএমের ভূমিকা

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। নাকি, গৃহস্থকে বলি সজাগ থাকতে আর চোরকে বলি সিঁদ কাটতে। কোন্ বাংলা প্রবাদটি যুৎসই হবে সারদা গোষ্ঠীর গণ-প্রতারণার কারবার জনসমক্ষে আসার পর তৃণমূল সরকারের কাণ্ডকারখানা দেখে? অবিশ্বাস্য হারে চড়া সুদ বা জমি-ফ্ল্যাটের লোভ দেখিয়ে লক্ষাধিক আমানতকারীর কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে এবং হাজার হাজার এজেন্টদের পথে বসিয়ে সারদা-র প্রধান সুদীপ্ত সেন এখন ফেরার। ধরা পড়ার আগে বা পড়ে তার রহস্যজনক মৃত্যু অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাজ্যের সাম্প্রতিকতম 'চিট ফান্ড' কেলেংকারিটি ধামাচাপা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। সেক্ষেত্রে শাসক দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সারদার প্রতারণা ব্যবসা যোগসাজশের সবটা ধরা পড়বে না।

কিন্তু গত কয়েকদিনে যতটুকু সামনে এসেছে তাতে স্পষ্ট যে শাসক দলের আশীর্বাদ বিনা এই বিপুল জালিয়াতির জাল ছড়াতে পারত না, ফুলেফেঁপে উঠত না সুদীপ্ত সেন তথা হাবুল সেনের কারবার। তৃণমূল সরকার ও দলের নেতা-সাংসদ-মন্ত্রীরা এখন এই প্রতারণাচক্রের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে মরিয়া। পালের গোদাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে এবং চিট ফান্ডের নামে এহেন সর্বনেশে ব্যবসায় লাগাম পরানোর জন্য কড়া আইন আনার আশ্বাস দিয়ে সরকার ও দলের মুখরক্ষার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল-সারদার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আমানতকারী ও এজেন্টদের মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না। তারা সাফ জানাচ্ছেন, তৃণমূল সরকার ও দলের সঙ্গে সারদার মাখামাখি দেখেই তারা বিশ্বাস করেছিলেন। বহু জায়গায় স্থানীয় তৃণমূল নেতারাই হয় সারদা লগ্নি সংগ্রহ ব্যবসার মুরুব্বি এবং এজেন্ট নিয়োগকারী। বহু এলাকায় পার্টি অফিস আর সারদার অফিস একই বাড়িতে বা কাছাকাছি।

কিন্তু সারদা-তৃণমূল যোগসাজসের শুরু স্থানীয় স্তরে নয়, বরং তা পোক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরে, পারস্পরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই এই ঘনিষ্ঠতার শুরু। নির্বাচনের আগে তৃণমূলের দরকার বশংবদ মিডিয়া। সারদার প্রয়োজন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে জমি-বাড়ি ব্যবসা ও চিট ফান্ডের কারবারের সঙ্গে মিডিয়া বাজারেও বিপুলভাবে ঢুকে পড়ে সারদা গোষ্ঠী। নজিরবিহীনভাবে একের পর এক টেলিভিশন চ্যানেল টেকওভার শুরু করে তারা। তারা নিউজ, তারা মিউজিক, চ্যানেল টেন, এন ই বাংলা— সারদা হয় এককভাবে কিনে নেয়, নয় 'প্রতিদিন' সংবাদপত্র গোষ্ঠী ও অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারীতে নামে। বেঙ্গল পোস্ট, সকাল বেলা, প্রভাত বার্তা ও কলম নামে চারটি দৈনিক চালু করে। উর্দু আখবার-ই-মশরিক হস্তগত করে। শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া স্রেফ টাকার জোরে এটা সম্ভব হত না। সবকটি কাগজ ও নিউজ চ্যানেল খুল্লমখুল্লা শাসকদলের মুখপত্রে পরিণত হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 'কলম' পত্রিকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হন। তাঁর দল ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে সারদা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতাও প্রকাশ্য ছিল।

এতেই শেষ নয়। 'প্রতিদিন' পত্রিকার মালিক ও প্রধান সম্পাদক স্বপন সাধন (টুটু) বসুর তৃণমূল সাংসদ হিসাবে রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হলে তাঁর ছেলে সৃঞ্জয় বসু তাঁর জায়গা নেন। মশরিক ও অন্য একটি হিন্দি কাগজের সম্পাদক-মালিকদের রাজ্যসভার টিকিট মেলে। সবচেয়ে নজরকাড়া উত্থান ঘটে 'প্রতিদিন'-এর সাংবাদিক কুণাল ঘোষের। ওই প্রতিষ্ঠানে থেকেই তিনি সারদা গোষ্ঠীর মিডিয়া সাম্রাজ্যের সিইও পদে অধিষ্ঠিত হন। মমতার আশীর্বাদ-ধন্য কুণাল তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ হওয়ার আগেই সাংবাদিকতার যাবতীয় নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিগেডে মমতা সরকারের অভিষেক উৎসবের মঞ্চে জনসভা পরিচালকের ভূমিকা নেন। বস্তুত সরকারের সঙ্গে সারদা গোষ্ঠী তথা সুদীপ্ত সেনের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিলেন তিনিই।

শাসকদলের পৃষ্ঠপোষণায় সরকারি গ্রন্থাগারের জন্য খরিদযোগ্য পত্রপত্রিকার তালিকায় সারদা মিডিয়া গ্রুপের কাগজগুলি ছিল প্রথম সারিতে। এমনকি 'কলম' প্রকাশের আগেই সে ঐ তালিকায় ঠাঁই পেয়ে যায়। শাসকের আনুকূল্য ও ঘনিষ্ঠতার ফায়দা তুলে আমানত সংগ্রহের ব্যবসা দ্রুত বাড়িয়ে তোলে সারদা গোষ্ঠী। নিজের কাগজ তো বটেই, প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পত্রিকা ও চ্যানেলেও আবাসন প্রকল্প সহ রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত বিপুল অংকের চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন বেরোতে থাকে। মিডিয়া-বাজারে তখন সারদার বেতনভুকরা বলাবলি করতেন, আফ্রিকায় খনির মালিক সুদীপ্ত সেন! শাসক দলের আশীর্বাদধন্য হওয়ায় এবং চ্যানেলে-কাগজে গোষ্ঠীর বৈভব প্রদর্শনের দৌলতে আমানতকারী ও এজেন্টদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে সারদা। বিনিময়ে চড়া দরে মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবির সংগ্রাহকদের তালিকায় তার নাম এখন প্রকাশ্যেই শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া তিনি নাকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে (মতান্তরে সিবিআই-কে) একটি চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের চাঁইদের খাঁই মেটাতে তার কত টাকা গচ্ছা গেছে। একারণেই কিনা জানিনা, তৃণমূলের সাংসদ সোমেন মিত্র এবং তার কংগ্রেসি সতীর্থ ডালু চৌধুরীরা সারদা গোষ্ঠী ও অন্যান্য চিট ফান্ড কোম্পানির সর্বনাশা ব্যবসা সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেও মমতা সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। অন্যদিকে কুণাল ঘোষ ও তার সঙ্গীরা তখন চিট ফান্ড ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনে কাগজে ও চ্যানেলে কম্বুকণ্ঠ ছিলেন।

মিডিয়া টাইকুনবৃন্দ ও শাসক দলের মধ্যে আঁতাত এ রাজ্যে বা এ দেশে নতুন নয়। নানাবিধ করছাড়, বিজ্ঞাপনী আনুকূল্য,

সস্তায় জমি বা অন্য ব্যবসায়িক সুবিধার বিনিময়ে স্তাবক মিডিয়া খোঁজে সব রাজনৈতিক দলই। সিপিএম জমানাতে এ কাজটি হয়েছে সুকৌশলে। জি-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ২৪ ঘন্টা চ্যানেলটি পেশাদারিত্বে সারদা গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকলেও তা সিপিএম-এর চ্যানেল বলেই পরিচিত। এই সহযোগিতার নেপথ্যে জি-গোষ্ঠীর অনলাইন লটারির ব্যবসা লোটো-র প্রতি বাম সরকারের ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নিয়ে অভিযোগ তোলেন তৎকালীন বিরোধী তৃণমূল নেতৃত্ব। এটা ঘটনা যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে সিপিএম-এর মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট কৌশল অসফল হতে থাকে। তুলনায় তৃণমূলী জমানায় গোড়া থেকেই হুতোমী কালের মতো অশিক্ষিত, আমোদগেঁড়ে জমিদার-মুৎসুদ্দি-ফোতোবাবু ও ফেরেব্বাজ মোসাহেবদের হল্লায় নরক গুলজার।

এ রাজ্যে চিট ফান্ডের নামে লোক ঠকানোর ব্যবসার রমরমা সিপিএম জমানা থেকেই। সঞ্চয়িতা কেলেংকারির পর্বে তৎকালীন অশোক মিত্র কিছু কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আমানতকারীদের সাবধান করে সরকারি বিজ্ঞাপন বেরোত। সেই কাণ্ডের খলনায়ক ভূদেব সেনেরই আত্মীয় আজকের সুদীপ্ত সেন, একথা অনেক দিনই শোনা যাচ্ছে। মিত্রের উত্তরসূরী অসীম দাশগুপ্ত চিটফান্ডের নামে গণপ্রতারণার বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে নানা তর্জন-গর্জন করলেও কোনো দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর আইনি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি। নয়ের দশকে ওভারল্যান্ড, সঞ্চয়নী ইত্যাদি সংস্থার বেআইনি আমানত সংগ্রহ নিয়ে মামলায় যায় রাজ্য সরকার। কিন্তু নতুন নামে নতুন প্রতারকদের বাজারে নামা ঠেকাতে পারে নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় সারদা সহ চারটি সংস্থার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র কাছে নালিশ দায়ের করেছিলেন বলে অসীম দাশগুপ্ত দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য: সেবি নোটিশ পাঠালে তৃণমূল সরকার গা করেনি। বাম আমলের শেষদিকে প্রতারক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে বিধানসভায় আইন পাশ হলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেতে উদ্যোগী হয়নি মমতা সরকার, এমনটাই তাঁর অভিযোগ। অন্যদিকে তৃণমূলের দুই নম্বর নেতা মুকুল রায় সিপিএম জমানাতেই সারদার মতো সংস্থার রমরমার দিকে আঙ্গুল তুলেছেন। চিট ফান্ডের টাকায় সিপিএম-এর সম্পত্তিবৃদ্ধি ও নির্বাচনী তহবিল ভরার কথা বলেছেন।

এই তরজায় একটা কথা স্পষ্ট। বিরোধী ও শাসকদের ভূমিকা বদল হলেও তারা কেউই চিটফান্ডওয়ালাদের বিরুদ্ধে কখনই পথে নামেননি। কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। দুই প্রধান দলেরই নেতা-মন্ত্রী, কর্মী-সমর্থকেরা এই জালিয়াতি জালের সঙ্গে যুক্ত। কে না জানে সিপিএম জমানাতেই রিয়েল এস্টেট তথা জমি-বাড়ি ব্যবসার নামে মাছের তেলে মাছ ভাজার ব্যবস্থাটি শিল্পের স্তরে উন্নীত হয়। এই ব্যবসারই অন্য শাখা হলো চিট ফান্ড, যার মাধ্যমে সংগৃহীত ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর কষ্টার্জিত টাকা নামে বেনামে রিয়েল এস্টেট ও অন্যান ফাটকা বাজারে ঢুকছে।

মজা হচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাংক, সেবি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক- সকলের চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে সর্বস্বান্ত করার খেলা চললেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। মনমোহনী অর্থনীতিতে একদিকে ধারাবাহিকভাবে ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্প এবং ব্যাংকের আমানতি প্রকল্পে সুদ কমানো হচ্ছে কর্পোরেট চাপে। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির সাঁড়াশি চাপে নাজেহাল ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী শেয়ার বাজার- মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির জটিলতা জানেন না বা বোঝেন না। মাগগিগন্ডার বাজারে বেশি সুদ পাওয়ার আশায় প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন তারা। প্রতারণা ও লুঠের এই সমান্তরাল অর্থনীতির দায় আখেরে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই।

বিশ্বজিৎ রায়

কর্মচ্যুতির শর্তে রাজ্যের নয়া নিয়োগবিধি

রাজ্য সরকারি শূন্যপদে 'নিয়োগ-প্রোবেশন-স্থায়ীকরণ বিধি, ১৯৭৯'-এর বদলে আনলো নয়া বিধি। পোষাকি নাম- 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রোবেশন অ্যান্ড অ্যাবসর্পশন অফ গ্রুপ সি এমপ্লয়িজ) রুল্‌স, ২০১৩। এটা প্রযোজ্য করণিক সহ গ্রুপ সি পদের জন্য।

পূর্বের বিধি চালু হয়েছিল ২৫/৬/১৯৭৯, ৬০৬০-এফ আদেশবলে। সমস্ত ধরনের সর্বক্ষণের কর্মচারী, কন্টিনজেন্সি থেকে বেতন হয় এমন ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারী- এরা সকলেই ছিলেন এই বিধির আওতায়। বাদ ছিলেন সিজনাল মাস্টার রোল বা দৈনিক মজুরির কর্মচারীরা। এই বিধি সাধারণ স্তরে সব নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। এর মাধ্যমে নিযুক্ত হওয়া কর্মচারীরা তিন বছর পরে স্থায়ী ঘোষিত হতেন। চাকুরির প্রথম দিন থেকেই তাঁরা মহার্ঘভাতা, বাড়িভাড়া সহ পুরো বেতন পেতেন। সর্বোপরি, চাকরিচ্যুতির কোনো সংস্থান এই বিধিতে ছিল না।

এই নিরিখে করণিকহ গ্রুপ সি পদে নিয়োগের নয়া বিধি এতাবৎ অর্জিত সুযোগ ও অধিকার হরণকারী এক কালা ফরমান। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সর্বস্তরে নিয়োগ কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি। বামফ্রন্ট সরকারের একেবারে শেষ দিকে আদেশনামা হলো। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এসে পিএসসি-র প্রাসঙ্গিকতা খর্ব করে চালু করল স্টাফ সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। নিয়োগে স্বচ্ছতার প্রত্যাশাকে যা আরও বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালো।

নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পন্ন চাকুরিপ্রার্থীরা কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্য থেকে বাছাই হয়ে আসার পরও স্থায়ী পদে তাঁদের তিন বছর প্রোবেশনে থাকতে হবে। প্রতি বছর তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে। তা সন্তোষজনক হলে তবেই স্থায়ী হবার প্রশ্ন। তা 'সন্তোষজনক' না হলে বিদায়। এই তিন বছরে বেতন বলতে মিলবে কেবলমাত্র

পদ-নির্দিষ্ট বেতনক্রমের প্রারম্ভিক মূল বেতন অর্থাৎ গ্রেড পে ও ব্যান্ড পে। মহার্ঘভাতা ও বাড়িভাড়া ভাতা বাদ। যদিও ৩ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হবে।

এখন প্রশ্ন, লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর মধ্য থেকে কঠিন পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রমাণ করার পর যাঁরা চাকুরি পাবেন, প্রতি বছর তাঁদের আবার যে পৃথক মূল্যায়ন হবে— তার ভিত্তি বা মানদণ্ড কিছুই নেই। এঁদের যোগ্যতার পর্যালোচনাই বা করবে কে বা তারা? আসলে সরকার দক্ষতা-যোগ্যতা-নিষ্ঠা-আন্তরিকতা চায় না। চায় কেবল প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

নতুন যাঁরা চাকরিতে আসবেন, তাঁরা কাজ করবেন পুরোই। কিন্তু পুরো বেতন পাবেন না। সমপদের কর্মচারীদের থেকে তো বটেই, এমনকি গ্রুপ-ডি স্তরের থেকেও কম বেতন পাবেন এঁরা। সমকাজে সমবেতন নীতির চূড়ান্ত লঙঘন। বিপুল বেকার সংখ্যাকে ব্যবহার করে ঘৃণ্য শোষণ-বঞ্চনা করবে সরকার। মুখে বিরোধিতা আর কাজে ডিএফআইডি-বিশ্বব্যাঙ্ক-ডব্লিউটিও নির্দেশিত পথে কর্মী ও কর্ম সঙ্কোচন, বেতন বঞ্চনা। বামফ্রন্ট তৃণমূলে ফারাক নেই। এ নিয়োগ কার্যত চুক্তিতে নিয়োগেরই রকমফের। কারণ ছুটির ক্ষেত্রে যে ধারার উল্লেখ আছে তা প্রযোজ্য চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে। যে সরকার কর্মসংস্থানের গল্প বলে, তারাই তিন বছর পর চাকরি থেকে ঘাড় ধাক্কার সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করে রাখল। 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'।

একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। একটা বিশেষ সংবাদপত্রে বক্স নম্বর দিয়ে অতিক্ষুদ্র একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ২০১২-র মার্চে। সরকারি চাকরি। এ বছরের গোড়ায় দেখা গেল বেশ কিছু কর্মীকে অফিসে অফিসে পাঠানো হলো এই বলে যে তাদের মনোনীত করা হয়েছে। যে যে অফিসে এদের পাঠানো হলো- সেখানেই এদের বেতন দিতে হবে। কী পদ জানা নেই, কী কাজ জানা নেই। এ তো সেই গত শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার কথা মনে করাচ্ছে- চিরকুটে চাকরি!

এই নবনিযুক্তদের যোগ্যতা কী, কীভাবে এদের বাছা হলো, কেউ জানল না। নিয়োগ হয়ে গেল! এগারো মাসের চাকরি। মাস গেলে স্থির বেতন ৬৬০০ টাকা। এরা কারা তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তবু বলতে হয়, বেকারির সুযোগ নিয়ে এটা এদের সাথে নির্মম রসিকতা। এ যদি কর্মসংস্থানের ক্ষুদ্র নমুনাও হয়, তা হলে এর চাইতে বড় প্রতারণা আর কী হতে পারে?

সংবাদে প্রকাশ, পরিবহন দপ্তরে শুরু হয়েছে চুক্তিতে নিয়োগ। সিটিসি 'নো ওয়ার্ক নো পে'-র ভিত্তিতে ড্রাইভার, কন্ডাক্টর পদে কর্মী নিয়োগ শুরু করেছে। নিয়মিত কর্মীদের ন্যূনতম বেতন যেখানে প্রায় ১৩ হাজার টাকা, চুক্তিতে নিয়োজিত ড্রাইভার ও কন্ডাক্টররা সেখানে মাসে ২৬ দিন কাজ করে পাবেন যথাক্রমে ৬৫০০ ও ৫০০০ টাকা। স্থায়ী চাকরির ভাবনাটাই কি লুপ্ত হবার পথে?

সন্দীপ

নন্দীগ্রামের পরে...

গত ৮ এপ্রিল '১৩ তৃণমুল সংসদ শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বানে সল্টলেকে সিবিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নন্দীগ্রাম থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল সমর্থক তথা ভূমিরক্ষা আন্দোলনের কর্মী সল্টলেকে ঐ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অভিযোগ, নন্দীগ্রামে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করার ব্যাপারে সিবিআই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করছে না, কেসটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নন্দীগ্রামে ২০০৭ সালের ১৪ই মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে ১৪ জন মারা যান। এর বিরুদ্ধে এপিডিআর ও ক্ষেতমজুর সমিতি হাইকোর্টে মামলা করে। হাইকোর্ট এই গুলি চালানোকে বেআইনি ঘোষণা করে সিবিআই-কে পুলিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করার নির্দেশ দেয় বামফ্রন্টের আমলেই। অভিযুক্ত পুলিশেরা ব্যক্তিগতভাবে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। পরিবর্তনের পরে নবনির্বাচিত তৃণমূল সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল প্রত্যাহার করে। এরপর সিবিআই-এর তদন্ত করে চার্জশিট জমা করার কথা। কিন্তু চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার কোনও অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। প্রক্রিয়াগত প্রশ্নে সিবিআই ও রাজ্য সরকার পরস্পরকে দোষারোপ করে দায়মুক্ত হতে চাইছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কয়েকদিন আগে কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করে নন্দীগ্রামের সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেসের) শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দাবি করেন। এব্যাপারে তার বক্তব্যে ক্ষোভ ও হতাশা ঝড়ে পড়ে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, এই সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চান। এর পরে সিবিআই দপ্তরে বিক্ষোভ।

নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষ এবং তাদের মুখপাত্র হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর এই ক্ষোভ ও দাবি সঙ্গত হলেও সম্পুর্ণ চিত্রটা প্রতিফলিত করে না। এই প্রসঙ্গে আরও বহু কথা আজ পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে মুখরিত। বহু ক্ষোভ, বহু হতাশা, বহু প্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ উঠে আসছে। পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি, অনৈতিক কাজের অভিযোগ নন্দীগ্রাম ছাড়াও আরও অনেক ঘটনায় রয়েছে। কোথাও কি শাস্তি হয়েছে? শাস্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? পুলিশের অত্যাচারের শিকার যারা তারা কি ন্যায় বিচার পেয়েছে? এ বিষয়ে দায় কার? রাজ্য সরকারের দায় কতটুকু? শুধুমাত্র কি সিবিআই-এরই সদিচ্ছার অভাব? এরকম সমস্ত প্রশ্নই খুঁটিয়ে ভাবা দরকার। তাই এই লেখা। মতামতের ভিন্নতা থাকলেও প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

বামফ্রন্ট আমলে পুলিশি অত্যাচার

নন্দীগ্রামে ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির জমায়েতে আচমকা গুলি চালিয়ে নারী-শিশু সহ ১৪ জনকে বিনা প্ররোচনায় হত্যা করে পুলিশ। কিছু লোক নিখোঁজ। আহত, ধর্ষিতা অনেক। বামফ্রন্টের আমলে পুলিশি অত্যাচারের সবচেয়ে ভয়াবহ নিদর্শন নন্দীগ্রাম হলেও এটাই একমাত্র নয়। মোট

৫০০-র বেশি মানুষ পুলিশের গুলিতে হত। লক-আপে মারা গেছেন কয়েক শত। সিঙ্গুরে রাজকুমার ভুল পুলিশের মারে হত। তাপসী মালিকের হত্যার ঘটনার প্রমাণ লোপাট করা থেকে শুরু করে সুলেখা সোরেনকে নারী কিনা যাচাই করার জন্য উলঙ্গ করে পরীক্ষা করার দায় পুলিশের। খেজুরী থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিয়ে ভূমিরক্ষা কমিটির মিছিলে আক্রমণ করার ছক করার দায় পুলিশের। জঙ্গলমহলে ২০০৭ সাল থেকে মাওবাদী সন্দেহে শত শত গ্রেপ্তার, ছিতামনি মুর্মুর চোখ উপড়ানো, গর্ভবতী নারীর পেটে লাথি, স্কুল ছাত্র গ্রেপ্তার, বদলি গ্রেপ্তার, দিনের পর দিন কোর্টে পেশ না করে কিংবা একটা কেসে জামিন পেলে অন্য কেসে নাম জুড়ে দিয়ে কোর্ট থেকেই পুনরায় গ্রেপ্তার— সব মিলিয়ে এক মহাভারত। এর সাথে আছে সংঘর্ষের নামে হত্যা। লালমোহন টুডু, শশধর মাহাতো, সিদো সোরেন— একের পর এক। এইসব অপরাধের কোনোটার কি বিচার হয়েছে? তদন্তেরও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

বামফ্রন্টের আমলে ঘটে যাওয়া এইসব পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা বিধানসভা ভোটের আগে বারবার আলোচিত হয়েছে, তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে ক্ষমতায় এলে 'এই অন্যায়ের' বিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও পর্যন্ত অপরাধী পুলিশকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তৃণমূল সরকারের উদ্যোগ শূন্য। ফলে পুলিশের অত্যাচারের ঘটনা নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ারই হয়েছে শুধুমাত্র, পরিবর্তনের পরেও পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ভাবনাতেই ঠাঁই পায় নি। এটাই নিদারুণ বাস্তবতা।

তৃণমূল সাংসদ সম্পূর্ণ দোষ সিবিআই-এর উপর চাপিয়ে নিজের দলকে দায়মুক্ত রাখতে চেষ্টা করছেন। তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআই একেবারেই রাজনীতিমুক্ত নয়— এই অভিযোগ হয়ত সঠিক। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এই সংস্থা কোন্ তদন্তে অগ্রাধিকার দেবে, কোনটা ধামা-চাপা দেবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থের সাথেই জড়িত। বহুবার একথা প্রমাণিত। কেন্দ্রের সরকার সংখ্যালঘু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ত্রাণকর্তা সিবিআই। মায়াবতী, জয়ললিতা, মুলায়ম সহ আরও অনেকের ক্ষেত্রে সিবিআই-এর চাপ বহুবার কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। ফলত সিআইডি পক্ষপাতদুষ্ট, রাজ্য পুলিশ রাজনৈতিক আর সিবিআই কিংবা সিআরপিএফ নিরপেক্ষ ও আইনপ্রেমী— এরকম ধারণার সমর্থক না হয়েও বলা যায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে কিন্তু মূলত রাজ্য সরকারই দায়ী। রাজ্য সরকারের ভাবনা ও পরিকল্পনার মধ্যেই অপরাধী পুলিশের বিচার ও শাস্তির বিষয়টাকে সচেতনভাবেই ঠাঁই দেওয়া হয় নি। কিন্তু কেন?

শুভেন্দুবাবুরা দাবি তুলেছেন নন্দীগ্রামের দোষী পুলিশের শাস্তি চাই। তার মানে পুলিশ দোষ করেছে বলেই তাদের বিশ্বাস। অথচ দোষী পুলিশের অত্যাচারের শিকার যারা তাদের ন্যায় বিচার দেওয়ার দাবি তাঁরা তোলেন নি। বামফ্রন্ট আমলে পুলিশের অত্যাচারের শিকার বহু সাধারণ মানুষ, বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী। তাদের কেউ মারা গেছেন পুলিশের গুলিতে, কেউ আহত, কেউ ধর্ষিতা, আর অসংখ্য মানুষ মিথ্যা মামলায় জেলবন্দী অথবা জামিনে ছাড়া পেয়ে রয়েছেন, কেস চলছে। খুনের মামলা, হত্যার চেষ্টার মামলা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের মামলা, সরকারি কর্মচারীকে বাধাদানের মামলা, অস্ত্র আইন, ইউএপিএ ধারায় মামলা— কোনও অভিযোগই প্রায় বাদ নেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়া। আন্দোলন স্তব্ধ করার, ভয় পাইয়ে দেওয়ার, টাইট দেওয়ার সরকারি বদ-মতলবে। নন্দীগ্রাম থানায় ৩২৫টি, খেজুরি থানায় ৩০০টি, সিঙ্গুরে ৮৯টি, জঙ্গলমহলে কয়েকশত পুলিশি মামলা চলছে— যার বেশিরভাগই রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজাত। এই মামলায় জড়িত বেশিরভাগই বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের অত্যাচারের শিকার। এরা অপরাধী নন। শাসকদলের মন্ত্রী সিঙ্গুরের বেচারাম মান্নার বিরুদ্ধেই প্রায় ৫৪টি জামিন-অযোগ্য ধারার মামলা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা রয়েছে। ছত্রধর মাহাতোর বিরুদ্ধে এমনকি ইউএপিএ পর্যন্ত চাপানো হয়েছে।

পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকার এদের কারও বিরুদ্ধে কোনও মামলা এখনও পর্যন্ত তোলেনি। কয়েক হাজার রাজনৈতিক বন্দী— কারোর এখনও মামলা থেকে অব্যাহতি মেলে নি। বরং নতুন করে বেশ কয়েক শত রাজনৈতিক কর্মীকে নতুন করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে চাপানো মিথ্যা মামলায়। দেবলীনাকে নন্দীগ্রামের মামলায় ইউএপিএ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে। শুভেন্দুবাবুরা কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেননি। অত্যাচারী পুলিশের শাস্তি দাবি করাটা যদি আন্তরিক হয় তাহলে পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে যারা বন্দী অথবা মামলায় ফেঁসে রয়েছেন তাদের মুক্তি দেওয়ার দাবিটাও না করে পারা যায় না। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের এখনও অপরাধীই ভাবে, তাই পুলিশের অপরাধও তার কাছে শাস্তিযোগ্য নয়। বামফ্রন্ট আমলে অত্যাচারী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া আর রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রক্রিয়াকে প্রায় নাকচ করে দেওয়া আসলে একটাই দৃষ্টিভঙ্গি। এব্যাপারে রাজ্য সরকারের আচরণ দ্বিধাহীন, স্পষ্ট। নির্বাচনের আগে যে পুলিশ ছিলো অত্যাচারী, তারা আজ সহযোগী, বন্ধু। আর বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গীরা আজ অপরাধী, তাই বন্দী। নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির এই আমূল বদল দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি, আর এমনটাই হয়।

পুলিশ-শাসকদল-সরকার

বামফ্রন্ট আমলে পুলিশকে দলের নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং পরিবর্তে পুলিশের যে কোনও অপরাধ আড়াল করতে সরকার ও দল পুলিশের পাশে থাকতো। মমতার ভাষায় পুলিশ ছিলো দলদাস। বর্তমান সরকারও পুলিশকে 'দলদাস' হিসাবেই দেখতে চায়, রাখতে চায়। সারা রাজ্য জুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিরোধিতা দমন করার ক্ষেত্রে পুলিশই

সরকারের হাতিয়ার। লোবাগ্রাম, মগরাহাট, নোনাডাঙা, ধর্মতলা— সরকার-বিরোধী যে কোনও আন্দোলন দমনে পুলিশের বেআইনি কার্যকলাপ সরকারের প্রশ্রয়েই। সরকারের নির্দেশেই। পার্কস্ট্রীটে ধর্ষণের ঘটনাই হোক, আর গার্ডেনরীচে পুলিশ হত্যাই হোক, কিংবা প্রেসিডেন্সীতে ভাঙচুরই হোক— পুলিশের তদন্ত সরকার তথা শাসকদলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই পরিচালিত। পুলিশের নিরপেক্ষ হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করলে দময়ন্তী সেন বা পচনন্দার মতো দশা হবে। বামফ্রন্ট আমলে পুলিশ-সরকার-শাসকদলের যে মিথোজীবিতা মানুষকে ক্রোধান্বিত করে তুলেছিলো বর্তমান সরকার দেওয়া-নেওয়ার সেই অর্থনৈতিক যোগযাজসটাকে আরও নগ্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের অন্যায় সরকার মাফ করে দেবে, আর পুলিশ শাসকদল তথা সরকারের সব আবদার মিটিয়ে যাবে। এই যদি চিত্র হয় তাহলে তৃণমূল সরকার পুলিশের শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেবে, এই প্রত্যাশার কোনও যৌক্তিকতা আছে কি?

পুলিশ হলো বন্ধু— আন্দোলনের সাথীরা আজ শত্রু

পুলিশ সম্পর্কেই যে বর্তমান সরকারের মনোভাব বদলেছে শুধু তাই নয়। যাদের উপর অত্যাচার করার জন্য পুলিশের শাস্তির কথা উঠছে, আন্দোলনের সেইসব সাথীদের সম্পর্কেও সরকারের তথা শাসকদলের মনোভাব বদলে গেছে। সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে, জঙ্গলমহলে বা অন্যত্র যারা বামফ্রন্টের অপশাসন- অত্যাচার-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সাহসী, আপসহীন। এদের কেউ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কেউ ছত্রধর মাহাতো, কেউ রাধারাণী আড়ি, কেউ মধুসূদন হালদার। এদের লড়াইয়ের ওপর ভর করেই বামফ্রন্টের শক্ত দুর্গে ফাটল ধরানোর সূত্রপাত। নির্বাচনের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এদের বীর, গণতন্ত্রের বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সরকারে আসার পর এই স্বাধীনচেতা আপসহীন মানুষেরা বর্তমান সরকারের কাছেও শত্রু এবং বিপজ্জনক। এদের মুক্তি হোক সেটা তাই সরকার চায় না। এরা মুক্ত বাতাসে থাকলে সরকার তথা শাসকদলের দুশ্চিন্তার কারণ। পুলিশকে শাস্তি দেবার জন্য এই সব অত্যাচারিত মানুষের প্রতি যে সমবেদনা থাকা দরকার সেটা আর তৃণমূলের নেই। তাই আজ নন্দীগ্রাম দিবস, সিঙ্গুর দিবসেও তৃণমূলের বা মুখ্যমন্ত্রীর কোনও উৎসাহ বা উদ্যম চোখে পড়ে না।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা দুর্বল হোক— এটা কেউ চায় না

সরকার বা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানুষ যখন আন্দোলন করে, রুখে দাঁড়ায়, তখন তারা শাসকদলের বিরুদ্ধে যেমন ক্ষোভ উগড়ে দেয়, একই সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জ করে। 'রাষ্ট্র বা সরকার চাইলেই সেটা মানতে হবে'— এই ধরনের কোনও ফতোয়াকে তারা চ্যালেঞ্জ করে। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। বামফ্রন্ট আমলে গড়ে ওঠা মানুষের সিপিআইএম বিরোধী ভূমিকাকে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের প্রয়োজনে সমর্থন দিলেও, এই রাষ্ট্রবিরোধী বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কারণ শাসকদল হিসাবে তৃণমূল চায় রাষ্ট্র বা সরকারের সর্বময় কর্তৃত্বে মানুষ বিশ্বাস করুক। আসলে, রাষ্ট্র বা সরকারের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হোক এটা কোনও শাসকদলই চায় না। তৃণমূলও চায় না। সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ তৃণমূলের নির্বাচনী পুঁজি, কিন্তু রাষ্ট্র তথা সরকারি কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের জেহাদ শাসক দল তৃণমূলের পক্ষে সমর্থন করা অসম্ভব। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তৈরি হতে পারে এমন কোনও কাজ তৃণমূল দল এখন করতে চায় না। পুলিশ, মিলিটারি হলো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পুলিশকে শাস্তি দিলে রাষ্ট্রের সেই হাতিয়ার সম্পর্কে মানুষের ভীতি কমে যাবে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের অঙ্গ পুলিশকেও আইনমাফিক শাস্তি দেওয়া যায় এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিশের বেআইনি কাজকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা তৈরি হবে। এতে সরকারের পক্ষে পুলিশকে নিজেদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার অবাধ সুযোগ খর্বিত হবে। সরকার বা শাসকদল তৃণমূল মোটেই তা চায় না। পুলিশকে শাস্তি না দিলে পুলিশকে বার্তা দেওয়া যাবে যে, এ আমলেও শাসকদলের দাস হয়ে থাকাটাই তার ভবিতব্য। দলদাস হলে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনও বিপদ নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ হতে চাইলে দময়ন্তী সেন। এর আগে '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন তৈরি হয় তখনও '৭২-৭৭ জমানার পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত করা হবে এবং দোষী পুলিশদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। চার-চারটে তদন্ত কমিশনও হয়েছিল। কিন্তু একজন পুলিশেরও শাস্তি হয় নি। বরং অত্যাচারী রুণু গুহনিয়োগীর প্রমোশন হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনতার হয়ে পুলিশ-প্রশাসনের অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে কাজ করাটাই উচিত ছিল। পরিবর্তে অত্যাচারী, অন্যায়কারী পুলিশকে জনতা ক্ষোভ থেকে বাঁচানোর ঢাল হিসেবে কাজ করাটাই শাসকদলের (জনপ্রতিনিধি) মুখ্য প্রবণতা। ভিখারী পাসোয়ানকে হত্যা করেও হরমনপ্রীত সিং বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে সবরকম সুরক্ষা-সহযোগিতা পেয়েছিল। এ আমলে সুদীপ্ত গুপ্ত পুলিশ হেফাজতে মারা গেলেও তদন্তের আগেই মুখ্যমন্ত্রী এটাকে 'দুর্ঘটনা' বা 'তুচ্ছ ঘটনা' বলে উড়িয়ে দেন। তেহট্ট, লোবাগ্রাম, মগরাহাটে পুলিশের গুলিচালনার বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। 'সরকার পুলিশকে ঘাঁটাবে না, আর পুলিশ শাসকদলকে চটাবে না'— এই মন্ত্রেই কাজ চলেছে, এখনও চলছে। এই সত্য মাননীয় সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীও ভালোভাবেই বোঝেন। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষ এই সত্য মানিয়ে নিতে না পারায় তাঁর পায়ের মাটি আলগা হচ্ছে। সেই ভয় থেকেই এই আন্দোলন— রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া কিংবা দোষী পুলিশকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং অনীহাকে আড়াল করতেই সিবিআই-এর বিরুদ্ধে তোপ। কিন্তু সরকারের ব্যর্থতা ও অনীহার বিরুদ্ধে লড়াই না করে দোষী পুলিশকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।

সঞ্জীব আচার্য

ঋণ আর লুঠের পাকচক্রে ভারতের কৃষক

প্রণব দে

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 'আত্মহত্যার প্রচেষ্টায়' অপরাধের মাত্রা যতটা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা তার থেকে দশগুণ বেশি অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অপরাধী যদি নিজেই নিজের বিচার করে, কোন আইন তাকে শাস্তি দেবে? ইরম শর্মিলা বারো বছর ধরে অনশনের ভাষায় 'আফস্পা' আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার তাঁর দাবি মানেনি, বরং অনশন প্রতিবাদকে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা বলে শর্মিলার বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযোগ এনেছে। এটা 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের' পুলিশের পক্ষেই সম্ভব। বৃটিশ শাসকরাও এটা ভাবতে পারেনি। উদ্ভাবনী ক্ষমতায় স্বাধীন দেশের সরকার ঔপনিবেশিক সরকারকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমার একটা সহজ-সরল প্রশ্ন আছে। শর্মিলা যদি তথাকথিত 'আত্মহত্যার চেষ্টা' করেই থাকে, তাহলে তাঁকে প্ররোচিত করছে বা করেছে কে? আদালত কী পুলিশকে এই প্রশ্নটা করেছে? না, করেনি। করবেও না। কারণ, যদি করে, সামরিক বাহিনী এবং দেশের সরকারকেই শর্মিলা প্ররোচনাকারী হিসাবে চিহ্নিত করবে। এদের বিচার আদালতের ক্ষমতার বাইরে।

২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সরকারের নিজস্ব হিসাবে দু' লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' (এনসিআরবি) এই তথ্য পেশ করেছে। অবশ্য এই তথ্য কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নির্ভুল, সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য সরকারের অনুরোধে জেলাওয়ারী এক সমীক্ষা করেছিল। সাংরুর এবং ভাতিন্ডা— এই দুটি জেলাতে আট বছরে (২০০০-২০০৮) কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা, সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, ছিল ২৮৯০।[১] কিন্তু এনসিআরবি-র হিসাবে ঐ একই সময়ে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪৪। বিদর্ভে কৃষক আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সোরগোল পড়ে গেলেও, এই অঞ্চল সম্পর্কে পৃথক কোন তথ্য নেই। যাই হোক, সীমাবদ্ধ সরকারি পরিসংখ্যানেও যখন দেখা যায়, বিগত দশকে গড়ে বছরে ১৬৭৩১ জন কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে, তখন সেই একই প্রশ্ন জাগে— কারা এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মহত্যার মিছিলে সামিল করেছে? কেন মানুষগুলো বাঁচার পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো?

কৃষক আত্মহত্যা বিষয়ে বিদগ্ধ মহলে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। ভারত সরকারের নয়া উদারনীতিবাদী কৃষিনীতি যে কৃষকদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, এ ব্যাপারে অধিকাংশই একমত। বন্দনা শিবার অভিমত হলো, ''কৃষকদের আত্মহননের মূলে ছিল দ্রুতহারে ঋণ-দায় বৃদ্ধি। ঋণ নেতিবাচক অর্থনীতির, ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির প্রতিফলন। দুটি উপাদান কৃষির সদর্থক অর্থনীতিকে কৃষকের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অর্থনীতিতে রূপান্তর করেছে— উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের অবনমন। দুটি উপাদানই বাণিজ্য উদারীকরণ এবং কর্পোরেট বিশ্বায়নের নীতিতে নিহিত।''[২] ভারতের কৃষককে আর স্বাধীন কৃষক বলা যায়না। সার-বীজ-কীটনাশক ইত্যাদি উৎপাদন উপকরণের ক্ষেত্রে সে কর্পোরেট সংস্থার আজ্ঞাবাহী আর উৎপাদন খরচ যোগানের ক্ষেত্রে সে মহাজনের কৃপাপ্রার্থী। বৃহৎ কোন কর্পোরেট সংস্থা সঙ্কটাপন্ন হলে, সরকার উদারহস্তে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। সঙ্কটাপন্ন কৃষক সরকারের এই উদারমূর্তি দর্শনলাভে বঞ্চিত।

১৯৯৫ সাল থেকে এনসিআরবি কৃষিজীবী মানুষের আত্মহননের পরিসংখ্যান দিতে শুরু করেছে। প্রথমদিকে রাজ্যওয়ারি তথ্য প্রদানে ঘাটতি ছিল। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, ৯০-এর দশকে কৃষক আত্মহত্যার প্রবণতা ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'ইন্ডিয়া' যখন 'সাইনিং', কৃষক তখন 'ডাইং'। প্রকৃতপক্ষে ২০০৪ সালে ইউপিএ-১ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, পরিসংখ্যানের বিচারে কৃষক আত্মহত্যা তখন সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইউপিএ সরকারও প্রথমে কৃষক আত্মহত্যার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায়নি। কিন্তু বিদর্ভে ধারাবাহিক মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারেরর পক্ষে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। ২০০৮ সালে সরকারের টনক নড়লো। এমনি এমনি অবশ্য টনক নড়েনি। পরের বছর, অর্থাৎ ২০০৯ সালে ছিল সাধারণ নির্বাচন। দেশজোড়া অধিগ্রহণ-বিরোধী ও *সেজ*-বিরোধী আন্দোলনের চাপে তখন ইউপিএ-১ সরকার জেরবার। কৃষক আত্মহত্যার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কিছু রিলিফ কর্মসূচি না নিলে নির্বাচনে মুখরক্ষা দায় ছিল।

২০০৮ সালের বাজেটে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় 'কৃষিঋণ মকুব এবং ঋণ সাহায্য প্রকল্প' (Agricultural Debt Waiver And Debt Relief Scheme, 2008) ঘোষণা করেন। সংক্ষেপে, এই প্রকল্পে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাংক/সমবায় মারফত, কৃষি উৎপাদনের বা কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের জন্য প্রাপ্ত ঋণ মকুব করা হয়েছিল। অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকদের ক্ষেত্রে, এই ধরনের ঋণে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্প কৃষকদের জীবনে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, সে বিষয়ে সংশয় থাকলেও, সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত সরকারের 'কম্প্রটোলার ও অডিটর জেনারেলের' (ক্যাগ)

সারণী- ১: জোতের পরিমাণ অনুসারে কৃষকদের শ্রেণীগত ঋণগ্রস্থতার পরিসংখ্যান					
জমির পরিমাণ	*কৃষি পরিবারের সংখ্যা (০০)*	*কৃষি পরিবারের শতাংশ*	*ঋণগ্রস্থ পরিবার (০০)*	*মোট ঋণগ্রস্থ পরিবারের শতাংশ*	*শ্রেণীগত ঋণগ্রস্থতা (শতাংশ)*
০.০১হেক্টরের কম	১২৫৯৪	১.৪	৫৭০৮	১.৩	৪৫.৩
০.০১- ০.৪০ হেঃ	২৯২৮৬৭	৩২.৮	১৩০১১২	৩০.০	৪৪.৪
০.৪১-১ হেঃ	২৮৩৬১০	৩১.৭	১২৯২১১	২৯.৮	৪৫.৬
১.০১-২ হেঃ	১৬০৬০০	১৮.০	৮১৯২০	১৮.৮	৫১.০
২.০১-৪ হেঃ	৯৩৫০৪	১০.৫	৫৪৪০৯	১২.৫	৫৮.২
৪.০১-১০ হেঃ	৪২৫৮১	৪.৮	২৭৭৩৪	৬.৪	৬৫.১
১০ হেক্টরের বেশি	৭৭৪৮	০.৮	৫১৪৮	১.২	৬৬.৪
সর্বমোট	৮৯৩৫০৪	১০০	৪৩৪২৪২	১০০	৪৮.৬

রিপোর্ট[৩] প্রমাণ করেছে যে এই প্রকল্প লুঠের বাজারের ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়েছে। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভারতের কৃষকদের ঋণচিত্রটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুটি সারণী প্রস্তুত করা হয়েছে।[৪]

সারণি-১ থেকে দেখা যায়, প্রায় ৪.৩৪ কোটি বা ৪৮.৬ শতাংশ কৃষি পরিবার ঋণগ্রস্থ এবং মোট ঋণগ্রস্থ পরিবারের ৬১ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক, যাদের জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের কম। সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, জমির পরিমাণ কম হওয়ার সাথে সাথে সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানকারী সংস্থা, যথা সমবায়/ব্যাঙ্ক ইত্যাদির আনুকূল্যও কমছে। মহাজন-ব্যবসায়ীদের উপরই প্রান্তিক কৃষকরা নির্ভরশীল। কিন্তু বড় জোতের মালিকদের গরিষ্ঠাংশ সমবায়/ব্যাংকগুলি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। অপরদিকে প্রান্তিক কৃষকদের ৫৩ শতাংশ (সংখ্যায় প্রায় ১.৫ কোটি) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ লাভে বঞ্চিত ছিল। এটাই কৃষিক্ষেত্রের ঋণচিত্র, এটাই গ্রামাঞ্চলের ধারা।

সরকারের ঋণ মকুব প্রকল্পের সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে সমবায় বা ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা হতে হবে, এটাই ছিল শর্ত। এনএসএসও-র সমীক্ষাকাল যদিও ২০০৩ সাল, কিন্তু এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ২০০৮ সালের মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন পরিবর্তন হয়েছিল। সুতরাং, বলা বাহুল্য, সরকারের প্রকল্পে অধিকাংশ প্রান্তিক কৃষকের খুব একটা সুরাহা হয়নি। কৃষকদের একটা বড়ো অংশ প্রকল্প থেকে ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল। *ক্যাগ*-এর রিপোর্টেও কৃষক ছাঁটাইয়ের আংশিক স্বীকৃতি মিলেছে।

ক্যাগ রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, সরকারি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ কোটি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ অন্যান্য

সারণী ২: কৃষি জোতের বিচারে শ্রেণীগতভাবে কৃষকদের ঋণের উৎস					
জোতের আয়তন	*ঋণের উৎস*				
	সরকার	*সমবায়*	*ব্যাঙ্ক*	*মহাজন/ ব্যবসায়ী*	*অন্যান্য*
০.০১ হেক্টরের কম	১.৯	৫.৩	১৫.৪	৫১.৩	২৬.১
০.০১- ০.৪০ হেক্টর	৪.০	১৪.৫	২৪.৮	৩৬.৭	২০.০
০.৪০-১ হেক্টর	৩.৮	১৭.০	৩২.০	৩৫.৪	১২.৮
১-২ হেক্টর	১.৭	২০.৫	৩৫.৪	৩০.১	১২.২
২-৪ হেক্টর	১.৫	২২.৬	৪১.০	২৮.১	৬.৯
৪-১০ হেক্টর	১.৩	২৩.০	৪৪.৫	২২.৮	৮.৩
১০ হেক্টরের বেশি	১.৭	২৩.২	৪২.৭	২৭.৮	৪.৬

কৃষক। একুনে ৩.৬৯ কোটি কৃষিজীবী মানুষ। বিগত চার বছরে ৩.৪৫ কোটি কৃষকের ৫২ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই দাবির যথার্থতা নিয়ে ক্যাগ নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। *ক্যাগ* ২৫টি রাজ্যে ৯২টি জেলায় ৭১৫টি ব্যাংক/সমবায় শাখায় ৯০৫৭৬টি কেস বা অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করেছিল। সরকার ঘোষিত মোট উপকৃত কৃষকের মাত্র ০.২৬ শতাংশকে ক্যাগ পরীক্ষা করেছিল। *ক্যাগ*-এর যা কিছু পর্যবেক্ষণ এবং মন্তব্য, তা এই পরীক্ষিত গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ পরীক্ষাতে যে অসঙ্গতি ধরা পরেছে, তাতে অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে, এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিশাল এক হিমশৈল আড়ালে বিরাজ করছে। *ক্যাগ* রিপোর্টে প্রধান আপত্তিকর বিষয়গুলি হলো:

(ক) সর্বপ্রকারে যোগ্য হলেও, বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কিছু কৃষককে এই প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রাপ্ত অর্থ, নির্দিষ্ট কৃষকের অ্যাকাউণ্টে জমা না দিয়ে, অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়েছে।

(গ) যে সকল কৃষকের 'ঋণ ছাড়' পাওনা ছিল, তাদের ছাড় না দিয়ে, ঋণদানকারী সংস্থা, পুরো টাকা আদায় করেছে।

(ঘ) অযোগ্য ব্যক্তিদের এই প্রকল্পে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। *ক্যাগ* যতগুলি অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করেছে, তাতেই এই রকম ৬৮২৩টি ক্ষেত্রে ২০.৫ কোটি টাকার গরমিল ধরা পড়েছে।

(ঙ) কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কারণে ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের সুবিধা বরাদ্দ ছিল। অথচ ঋণদানকারী সংস্থাগুলি গাড়ি-বাড়ি-ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণের ক্ষেত্রেও অনেককে এই প্রকল্পের সুবিধা বণ্টন করেছে। এমনকি যাবা কোন ঋণই নেয়নি, তাদেরকেও এই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। *ক্যাগ* তাদের নমুনা সমীক্ষায় ৬৭৯০টি ক্ষেত্রে ২০.৫ কোটি টাকার গরমিল প্রত্যক্ষ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৫২টি ক্ষেত্রে ৭৭ লক্ষ টাকা তছরূপের নজির পাওয়া গেছে।

(চ) সরকারি নির্দেশ ছিল, ব্যাংক বা সমবায় থেকে যারা সরাসরি ঋণ নিয়েছিল, তাদেরকেই এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। ক্যাগ-এর পরীক্ষায় ধরা পরেছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা (Micro Finance Institutions) ব্যাংকের বকলমে ঋণ-ব্যবসা চালিয়েছে এবং ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে কৃষকদের ঋণ দিত এবং সাপ্তাহিক আদায় করতো। ব্যাংক, আলোচ্য কৃষিঋণ মকুব এবং সাহায্যের অর্থও, ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষককে না দিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে দিয়েছিল। *ক্যাগ*-এর নমুনা পরীক্ষায় এইরকম বেআইনি অর্থ প্রদানের পরিমাণ ধরা পরেছিল ১৬৪.৬০ কোটি টাকা। এই টাকা প্রকৃত কৃষকরা পেয়েছে কিনা, *ক্যাগ* রিপোর্টে তার উল্লেখ নেই।

এছাড়া নথি-জালিয়াতি সহ অন্যান্য যেসব সাধারণ দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের 'কৃষিঋণ মকুব...' প্রকল্পে যে ব্যাপক দুর্নীতির সংকেত *ক্যাগ* রিপোর্ট দিয়েছে, তা নিয়ে সংসদ বা রাজনৈতিক মহলের বিশেষ মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যায়নি। এর একটা কারণ বোধ হয়, এই দুর্নীতিতে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়নি, যাকে কেন্দ্র করে রাজনেতিক ফায়দা তোলা সম্ভব। এটা এক গোষ্ঠীগত লুঠ এবং এই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক বা সম্ভবত সবকয়টি রাজনৈতিক রঙ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আর গরিবের পয়সা লুঠ হলে কে কবে গ্রাহ্য করেছে?

ক্যাগ-এর রিপোর্টে একটা বিষয় পরিষ্কার, কৃষকের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটা মোটা অংশ উদ্দিষ্ট কৃষকের কাছে পৌঁছয় নি। তাঁরা, ব্যাংক/সমবায়ের মতো গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সম্মিলিত তঞ্চকতার শিকার। একদিকে কর্পোরেট সংস্থা, মহাজনী দাপট, অপরদিকে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি— এই সাঁড়াশি আক্রমণে কৃষকের জীবন-জীবিকা, পেশাগত স্বাধীনতা বিপর্যস্ত। এটাও যদি প্ররোচনার যথেষ্ট কারণ না হয়, তাহলে প্ররোচনা বলে কাকে?

I accuse.

তথ্যসূত্র

১ Indebtedness and Suicides: Field Notes on Agricultural Labourers of Punjab- Vishav Bharti- EPW, April 2, 2011

2 The Suicide Economy of Corporate Globalisation- Vandana Shiva- Znet, 5 April, 2004

3 Report of the Comptroller and Auditor General of India on Implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme. 2008- Laid on the table of the Parliament house on 05-03-2013

4 Indebtedness of Farmer Households- NSS 59th Round- Report No. 498- Jan-Dec 2003

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে
আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর
৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

প্রবন্ধ

উগো চাভেজ ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের ঐতিহ্য

সুচরিতা সেন

উগো চাভেজের আকস্মিক ও আজকের হিসাবে অকাল-মৃত্যু তাঁর নিজের দেশ ভেনেজুয়েলার, লাতিন আমেরিকার ও সাধারণভাবে বিশ্বের বামপন্থার, অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই শূন্যস্থান কেউ পূর্ণ করতে পারবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতই দিতে পারে। তবে চাভেজের জীবন ও কাজের জটিলতা ও বহুমুখীনতা লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী ঐতিহ্যকেই প্রতিফলিত করে, এ কথা সন্দেহাতীত। এক নজরে বিষয়টি দেখা যাক।

চাভেজ অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সামরিক অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়ে একজন প্যারাট্রুপার হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। বাম বা র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী সামরিক অভ্যুত্থান বা ক্যু-দে-তা তৃতীয় বিশ্বে বিরল নয়। তার ফল সর্বদা একরকম হয় না। চাভেজ অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিলেন। দু বছর বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। মুক্তিলাভের পর তিনি কিউবাতে আমন্ত্রিত হন সিমন বলিভারের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য। লাতিন আমেরিকার স্পেন বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের নেতা সিমন বলিভার এক আইকন। আর্জেন্টিনার আর্নেস্তো (চে) গেভারা যখন কিউবার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে বলিভিয়ার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, তখন বলিভার ছিলেন তাঁর আদর্শ। চে-কে বন্দী করে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়। তাঁর ফরাসি সঙ্গী রেজি দ্রেব্রে বিচারের সময় স্বপক্ষে বলিভারের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। বলিভার তো লাতিন আমেরিকার বিষয়ে কোনো সীমান্ত মানেন নি।

উগো হাভানায় পদার্পণ করার পর তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা করতে আসেন স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো। সেই থেকে উগোর মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই বিপ্লবী নেতার মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় পিতা পুত্রের মতো। কাস্ত্রো পরে বলেছেন, চাভেজ তাঁর গোটা মহাদেশে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

দেশে ফিরে চাভেজ বুলেট ছেড়ে ব্যালটের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এটাও লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক খানদানে অজানা নয়। এই মহাদেশের ঐতিহ্য বহুমুখী। আমরা দেখেছি, বলিভারের নেতৃত্বে ক্রিয়ল ও আদিবাসীরা স্পেনের শাসনের শেকল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ও মুক্তির ইতিবাচক ছবি তুলে ধরেছিল। তবে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভূমিপুত্ররা প্রকৃত মুক্তি পান নি। দাসপ্রথার অবশ্য অবসান ঘটেছিল, ব্রেজিল ও কিউবায়। সারা লাতিন আমেরিকা একত্রিত হবে, বলিভারের এই স্বপ্নও সফল হয় নি। নিঃসঙ্গতায়, প্রায় নির্বাসনের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তার অবিস্মরণীয় উপাখ্যান আমরা পাই মার্কেসের উপন্যাস, *The General and His Labyrinth*-এ। তার পর থেকে সংগ্রাম চলে আসছে, বহু সময়, বহু ধারার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুপাক আমর নামে প্রাচীন ইনকা রাজবংশের একজন স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত তুপামোর বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল। জনগণতান্ত্রিক বিদ্রোহের সাথে সেখানে মিশেছিল ভূমিপুত্রদের ঐতিহ্যগত সংগ্রাম।

সশস্ত্র বিপ্লবের পথ আধুনিক লাতিন আমেরিকায় প্রধান হলেও একমাত্র পথ নয়। এই নদীতেও মিশেছে অনেক জল— ব্যালট বক্স, পরিবেশ আন্দোলন, ভূমিপুত্র বা প্রাক-কলম্বাস আদিবাসীদের দাবিদাওয়া, নারীর অধিকার। অনেক সময় এ সব পারস্পরিক ভাবে যুক্ত। বন্দুক হাতে তুলে নেওয়া থেকে আইনের জমিতে লড়াই বা এনজিও-দের আন্দোলন, কিছুই বাদ যায় নি। গুয়াতেমালার নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তা আদিবাসী রমণী রিগোবের্তা মাঞ্চু তার এক উদাহরণ। নব্বইয়ের দশকে ইকুয়াদোরে কিছু মার্কিন কাঠ কোম্পানি সামান্য উপহারের বিনিময়ে আদিবাসীদের বনজ অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। যেমন উপনিবেশবাদের প্রথম যুগে শ্বেতাঙ্গরা পুঁতির মালা, 'লাল জল' ইত্যাদি দিয়ে ভূমিপুত্রদের ভূমির স্বত্ব কিনে নিত। এ নিয়ে মার্কিন বিচারালয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন কতিপয় মার্কিন আইনজীবী। এনজিও-রা দূষণ নিয়ে আন্দোলন করেছিল। '*পুয়েবলা* (গ্রামীণ) পরিকল্পনা' অনুসারে দক্ষিণ মেহিকো (মেক্সিকো) ও মধ্য আমেরিকার জমির এক বড় অংশ দখল করা হয়েছেল রেল, বন্দর , হাইড্রোকার্বন ইত্যাদির জন্য। তার দরুন অসংখ্য জৈব বৈচিত্র্য নষ্ট ও অন্তত আটটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ঘরছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এখানেও এনজিও, জনগোষ্ঠী ও অন্যান্যদের আন্দোলন উচ্ছেদ ঠেকিয়ে দেয়।

সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য লাতিন আমেরিকার গর্ব, তুপাক আমর ও বলিভারের সময় থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মেক্সিকোর উপর এক ইউরোপীয় শাসক চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছিল বেনিতো হুয়ারেজের নেতৃত্বে। অনুরূপভাবে ১৯১০-২০ সালের মধ্যে কৃষক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে মানুষ অনুসরণ করেছিল এমিলিয়ানো জাপাতা ও রবিন হুড সুলভ দস্যু বিদ্রোহী পাঞ্চো ভিলাকে। জাপাতার উত্তরসূরীদের মধ্যে

কার্দেনাস ব্যাপক ভূমিসংস্কার করেছিলেন, যা বাম দেশগুলির বাইরে লাতিন আমেরিকায় তুলনাহীন।

নব্বইয়ের দশকে *নাফটা* (North Atlantic Free Trade Agreement, NAFTA) মেক্সিকোর সর্বনাশ করে। 'মুক্ত বাণিজ্য নীতিক অনুসারে সস্তা মার্কিন শস্যের বন্যা মেক্সিকোর বাজারকে ভাসিয়ে দিয়ে চাষিদের পথে বসায়। জাপাতা বা কার্দেনাসের আমলে এক টুকরো জমি পেয়ে যারা দু মুঠো খেতে পাচ্ছিল, তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জমিজায়গা ঘর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে ও দিচ্ছে উত্তরে মার্কিন সীমান্তের দিকে। সেখানে প্রধানত মাকিনাদোরা বা মার্কিন মালিকানাধীন কল কারখানায় কাজ করে জীবন ধারণ করে। মজুরি বা কাজের পরিবেশ ঈপ্সিত নয়। এই অবস্থায় জাপাতার নাম ও স্মৃতি বহন করে সৃষ্টি হয়েছে জাপাতিস্তা দল। গেরিলা যুদ্ধ চালানো সত্ত্বেও জাপাতিস্তাদের রণনীতি কিঞ্চিৎ বিচিত্র। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টার চেয়ে যেন তারা অধিক আগ্রহী সমান্তরাল জনমুখী এক রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। যেমন, কোনো বহুজাতিক কোম্পানির দূত কারবার করতে এলে তাকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হবে স্থানীয় জাপাতিস্তা সদর দপ্তরে।

আদিবাসী, বামপন্থী ও এনজিও-র আন্দোলন বৈদেশিক ঋণের বিনিময়ে অর্থাৎ ধার শোধ করতে আমাজনের অমূল্য উপত্যকা বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা ঠেকিয়েছিল। আন্দিজ পর্বতের ও আমাজন উপত্যকার অধিবাসীদের ঐক্য গড়ে তোলার নানা প্রচেষ্টা ও সংগঠন লক্ষণীয়। কালো দাসদের বংশধররাও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ব্যালট ও বুলেট। প্রতিক্রিয়াশীল, মার্কিন মদতপুষ্ট ফ্যাসিবাদী শাসকশ্রেণী ব্যালট গ্রাহ্য না করলে, আবার অন্য পথ। সবই লাতিন আমেরিকায় পরিচিত, চাভেজের পরিপ্রেক্ষিতের অংশ। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক। গুয়াতেমালায় মধ্য চল্লিশ থেকে মধ্য পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রগতিশীল, মডারেট বাম সরকার ছিল। মার্কিন কোম্পানি ইউনাইটেড ফ্রুট্স সেদেশে প্রচুর অনাবাদী জমি ধরে রেখেছিল। সরকার তা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে অধিগ্রহণ করে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছিল। ফলস্বরূপ সিআইএ-র মদতপুষ্ট সশস্ত্র প্রতিবিপ্লব। নানা কারণে গুয়াতেমালার মানুষ তখন তেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু স্মৃতি থেকে গিয়েছিল। তার তিন দশক পর আশির দশক জুড়ে, নব্বইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেদেশে অব্যাহত ছিল সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পূর্ণ জয়ের বদলে শান্তিচুক্তি হয়। তবে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসীরা একেবারেই কিছু পায় নি তা নয়।

ষাটের দশকে ব্রাজিলে জোয়াও গুলার্তের মডারেট সরকার নির্বাচিত হয়েছিল। দু-একটি শিল্প জাতীয়করণ ও চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সামরিক অভ্যুত্থান তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। ব্রেজিল প্রায় দুই দশক সামরিক শাসনাধীন ছিল। এই সময় সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মারিগেলা, সম্ভবত গেভারা ও দেব্রের পর লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম চিন্তাবিদ। গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল গেরিলা যুদ্ধের পথে মুক্ত হয় নি। সামরিক শাসন অবসানের পর নানা ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিল। নতুন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন। ভূমিহীনদের আন্দোলন। বেশ কিছুদিন পর আন্দোলনের অন্যতম নেতা লুসিও ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা বা লুলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ব্রেজিলে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি মডারেট বাম সরকার। ভেনেজুয়েলার তুলনায় কম র‍্যাডিকাল। বর্তমান ব্রেজিলের প্রেসিডেন্ট, লুলার বাছাই করা উত্তরাধিকারী দিলমা রুশফ একদা গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন।

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রাম বৈচিত্র্য ও ঐক্যের এক দৃষ্টান্ত।

সত্তরের দশকে চিলিতে আইয়েন্দে (আলেন্দে) পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্রের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কিন খনিমালিকদের স্বার্থে আঘাত হানার দরুন মার্কিন মদতপুষ্ট সেনানায়ক পিনোচেট রক্তের নদীতে আইয়েন্দে ও তার সরকারকে ভাসিয়ে দিলেন।

আর্জেন্টিনা সামরিক শাসন পার হয়ে। নিও লিবারেল অর্থনীতির সংকট কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল কার্সনার দম্পতির (নেস্তর ও পরে তার স্ত্রী ক্রিস্তিনা) নেতৃত্বে অগ্রসর হয়েছে। সিআইএ ও প্রতিক্রিয়াশীল দেশজ শাসকশ্রেণীর হাত ধরে সামরিক ক্ষমতা দখলের ধারা একবিংশ শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ আছে। ২০০৯ সালে মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাসে যা ঘটেছিল। চাভেজকেও এভাবে অপসারিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জনপ্রতিরোধর জোয়ারে তা ভেসে গিয়েছিল।

বিশ্বের বৃহত্তম শক্তির নাকের ডগায় কিউবার জন্ম ও টিকে থাকা স্বাভাবিক ভাবেই ষাটের দশক জুড়ে লাতিন আমেরিকার নানা দেশে গেরিলা যুদ্ধ ও বিপ্লব প্রচেষ্টা ঘটিয়েছিল। এর মধ্যে মিশেছিল বিভিন্ন ধারা। ট্রটস্কিবাদ থেকে লিবারেশন থিওলজি বা বাম খ্রিষ্টান ধর্ম। কলম্বিয়ার ধর্মযাজক কামিলো তোরেজ এক হাতে ক্রুস, এক হাতে বন্দুক নিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। লিবারেশন থিওলজির এক জোরালো ধারা চাভেজের মধ্যেও ছিল। তিনি ছিলেন একদিকে গভীরভাবে ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী (সেটাই লাতিন আমেরিকার প্রধান ধর্ম) আর আসল বিপ্লবী। একেবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''যারা যীশুখ্রিস্টকে হত্যা করেছিল, বলিভারকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, তারাই আজ আমাদের বিরোধিতা করছে।'' চাভেজের শত্রুরা তাঁকে ইহুদি

বিদ্বেষী রূপে চিহ্নিত করতে চাইত। কারণ খ্রিস্টানরা মনে করে, ইহুদিরাই যীশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু বলিভারের সঙ্গে ইহুদিদের কী সম্পর্ক? চাভেজ আসলে ধনিক শ্রেণীর কথাই বলেছেন। তারা শত্রু ছিল সেই দুই হাজার বছর আগেও, আর আজও। চাভেজের মধ্যে কোনো বিশেষ জাতির প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ছিল না। বিপরীতে দেশের 'বিশুদ্ধ' শ্বেতাঙ্গ ধনিক শ্রেণী চাভেজ ও তাঁর সঙ্গীদের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখত। তারা দরিদ্র বলেও বটে, মিশ্র রক্তের মানুষ বলেও বটে।

আশির দশক জুড়ে লাতিন আমেরিকার সশস্ত্র বিপ্লবের আর এক ঢেউ এসেছিল। তারও নানা দিক ছিল। মধ্য আমেরিকার তিনটি দেশের কথা ধরা যাক। নিকারাগুয়াতে সাতের দশকের শেষে সান্দিনিস্তারা ক্ষমতা দখল করেছিল। দেশের প্রবাদপ্রতিম নেতা আগুস্ত সিজার সান্দিনো থেকে তাদের নাম। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেও তারা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি ঐ গণতন্ত্রকে মর্যাদা দেয় নি। মার্কিন ছত্রছায়ায় প্রতিবিপ্লবী কনট্রারা দেশ ছারখার করেছে। তাদের সহায়তা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রেগান কুখ্যাত রেগান-কনট্রা কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সে আর এক কাহিনী। কনট্রারা 'রেগানের পুত্র' নামে খ্যাত বা কুখ্যাত ছিল। অবশেষে ১৯৯৯-এর নির্বাচনে প্রবল চাপের মুখে সান্দিনিস্তারা পরাজিত হলো। প্রেসিডেন্ট হলেন মার্কিন সরকারের প্রিয়পাত্রী ভায়োলেতা সামোরা। বহুদিন পর সান্দিনাস্তারা এখন আবার নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

প্রতিবেশী দুই দেশ গুয়াতেমোলা আর এল সালভাদোরে ছিল বিপরীত চিত্র। সেখানে বামপন্থী গেরিলারা লড়ছিল প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত আপস হয়েছিল, কিন্তু সরকারি পক্ষ কথা রাখেনি। বর্তমানে এল সালভাদোরে চলছে যাকে বলে নিচু স্তরের সংঘর্ষ। মোটামুটি একই সময়ে পেরুতে মাওবাদী গেরিলা লড়ছিল আবিমেন গুজমান ওরফে চেয়ারম্যান গঞ্জালোর নেতৃত্বে। এই সংগ্রামও এক দশকের বেশি চলার পর সমাপ্ত হলো বিফলতা ও গঞ্জালোর বন্দীদশায়। কলম্বিয়াতে আজও বিপ্লবী বাহিনী (FARC) লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে মিটমাটের চেষ্টাও। বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, পার্লামেন্টারি রাজনীতি, ব্যালট, বুলেট, আদিবাসী ও নারীবাদী সংগ্রাম— এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত লাতিন আমেরিকার চাভেজ বিচার্য। ১৮৯৮ সালে তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হলেন। 'এল কমান্দান্তে' বা অধিনায়ক রূপেই তিনি খ্যাত ছিলেন।

বলিভারিয়ান বিপ্লবের এক বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। চাভেজ নিজেকে কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী বলতেন না। যদিও মার্কসবাদ সম্পকে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী সমাজবাদী, যার জাতীয়তাবাদ তাকে বামপন্থার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, কিউবায় যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল তারাই গোড়ায় ঘোষিতভাবে কমিউনিস্ট ছিল না। তবু যে রাষ্ট্র সেখানে গড়ে উঠেছিল তা ছিল মোটামুটি সোভিয়েত মডেলেই। বলিভারিয়ান বিপ্লব যে সব লাতিন আমেরিকান দেশে সংঘটিত হয়েছে, ইকুয়েদর, বলিভিয়া, সর্বোপরি ভেনেজুয়েলা— সেখানে মডেলটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বস্তুত সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তর্কাতীত নয়। কথাটির উৎসও বিতর্কিত। কিন্তু সাধারণভাবে মনে করা হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী নেতা ব্লাঁকি এটি প্রচলিত করেন। এই একনায়কতন্ত্র যে একটি দলের একনায়কবাদ, তেমন কথাও স্পষ্ট নয়। তবে নানা বাস্তব কারণে ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল। ব্লাঁকি নিজে অবশ্য মনে করতেন, বিপ্লবী রাষ্ট্রে সিকি শতাব্দীর মতো একটি দলের শাসনই শ্রেয়। ততদিনে লোকের অবস্থার উন্নতি হবে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। তারপর জনগণকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যাই হোক, বিকল্প ব্যবস্থা খুব একটা গড়ে ওঠে নি। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে সাংহাই কমিউন ও সত্তরের দশকে পশ্চিম ইউরোপে ইউরো-কমিউনিজম সম্ভাব্য বিকল্প রূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে— তার মধ্যে এখন যাব না— এসব ধারা বাস্তবে অস্তিত্বমান সমাজতন্ত্রের (Acually Existing Socialism) বিকল্প মডেল রূপে নির্মিত হতে পারে নি। বলিভারিয়ান বিপ্লবের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছিল। অত্যন্ত আগ্রাসী বিরোধী দলগুলির উপস্থিতি ও জঙ্গি কাজকর্ম মেনে নেওয়া হয়েছিল। মিডিয়ার সিংহভাগ দুবেলা চাভেজের মুন্ডপাত করত, সেন্সরশিপ ও নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। চাভেজকে বিরোধী দলগুলি, শাসক শ্রেণী ও মার্কিন-ভজা মিডিয়া একনায়ক রূপে চিহ্নিত করে। ব্রিটিশ কাগজ 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট জবাব দিয়েছে, যার জমানায় ১৭টি নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি একটু বিচিত্র ধরনের একনায়ক বৈকি। ঐ নির্বাচনগুলি অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল না, এমন কথা চাভেজের পরম শত্রুও দাবি করেনি। বরং প্রত্যন্ত গ্রামে নির্বাচনকেন্দ্র খুলে প্রত্যেককে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। চাভেজ সংবিধান বদল করে দুই টার্মের বেশি প্রেসিডেন্ট হওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে কম নিন্দেমন্দ সইতে হয়নি। এদেশের মিডিয়ার একাংশও তার

প্রতিধ্বনি করেছিল। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে তবেই প্রেসিডেন্টের পদ বজায় থাকবে, এটাই ছিল নিয়ম। ব্রিটেনে ও আমাদের দেশে অনুরূপ ভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন জিতে যতদিন খুশি সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করতে পারেন। নেহরু ভারতে স্বাধীনতা থেকে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। শেষ নির্বাচনে চাভেজ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছিল। তাও কম মনে হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে ফল আরো ভালো হয়েছিল। দেশের ২৩টি প্রদেশের মধ্যে ২০টিতে চাভিস্তা গভর্নর (ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সমতুল্য)।

এই উদার নির্ভেজাল গণতন্ত্র কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের মুগ্ধ করে নি, বা খেলার নিয়ম মানতে উৎসাহিত করে নি। ২০০২ সালে এক মার্কিন মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে চাভেজ বন্দী হলেন, কয়েক দিনের জন্য। আমরা দেখেছি, লাতিন আমেরিকায় এসব জলভাত। লাতিন আমেরিকার প্রতিবিপ্লবের ট্রেনিং ও সংগঠনের জন্য বিশেষ মার্কিন সংস্থা ও কেন্দ্র আছে। কেবল লাতিন আমেরিকা নয়, পঞ্চাশের দশকে মোসাদেক আমলে ইরানও স্মরণীয়। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম জন-প্রতিরোধ। রাজধানী কারাকাস ও অন্যান্য শহরের শ্যান্টি টাউন বা বস্তি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ পথে নামলেন। মার্কিন মিডিয়ার ভাষায়, রায়ট ও লুঠ করতে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির দাবি জানাতে। সাধারণ সৈনিকরা ও মাঝারি অধিনায়কদের একাংশ ভয় দেখান, চাভেজকে মুক্তি না দিলে তারা বন্দুকের নল ঘোরাবে সেনানায়কদের বিরুদ্ধে। ফল পেতে দেরি হলো না। আশ্চর্যের কথা, যারা অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল তাদের কারোকে শাস্তি দেওয়া হলো না। এই সম্পূর্ণ বেআইনি কাজকর্মকে সমর্থন জানিয়েছিল, তারাও পার পেয়ে গেল। একজন সত্যিকারের একনায়ক এমন অবস্থায় কী করতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চাভেজ ইউনাইটেড সোশালিস্ট দল গঠন করেছিলেন। আরও ব্যাপকভাবে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের আন্দোলন। এই কিছুটা ঢিলেঢালা সংগঠনের মধ্যে বামপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদী— নানা ধারা ছিল। পার্থক্যও ছিল না এমন নয়। যেমন মনে করা হয়, চাভেজের উত্তরাধিকারী নিকোলাস মাদুরো দল ও সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল অংশের নেতা। সেতেই বা অন্যান্য কিছু নেতা অপেক্ষাকৃত মডারেট। তবে চাভেজের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা সবাইকে একত্রে ধরে রেখেছিল।

ফিরে আসি চাভেজের আমলে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথায়। সামরিক প্রচেষ্টার পর অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী ও তাদের মার্কিন মুরুব্বিরা হাল ছেড়ে দিল না। এবার অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ। অনেক মালিক কলকারখানাগুলি লকআউট ঘোষণা করল। দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোলিয়াম সেক্টরে জারি হলো সাধারণ ধর্মঘট। চাভেজ ঠান্ডা মাথায় জনসমর্থনের ওপর ভিত্তি করে সব সংকটের মোকাবিলা করলেন।

যে চাভেজের একনায়ক নামে নিন্দা রটেছে, তার কাছে গণতন্ত্র শুধু কোনো নির্দিষ্ট সময় ভোট দেওয়া মাত্র ছিল না। ছিল তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী (participatory) গণতন্ত্র। ভোটদাতাদের সংগঠিত করা হয়েছিল 'নির্বাচনের লড়াই' ইউনিটে। এক একটা ইউনিটে ছিল ১৫-৩০ জন, বিভিন্ন পরিবার থেকে। নির্বাচনে প্রচারের বড় অংশ ছিল জনচেতনার উন্নয়ন। তাছাড়া ছিল কমিউনিটি অর্গানাইজেশন, যাকে বলা যায় পাড়া কমিটি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমনকি সামরিক ব্যাপারেও এসব সংগঠন অংশীদার ছিল। এরা কেবল জনচেতনা উন্নত করত না, নিচুতলা ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করত। জাতীয় পর্যায়ে জনচেতনা প্রতিফলিত হত।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভেনেজুয়েলায় যতখানি উন্নতি ঘটেছে, তেমন বোধহয় কলম্বাসের আগমনের পর কখনও হয়নি। ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১৩ বছরে মোট জাতীয়করণ করেছেন ১০৪৫টি সংস্থা। করেছেন কৃষি সংস্কার। ভেনেজুয়েলার কৃষি সংস্কার শুরু হয় ২০০০ সালে। জমি আইন ডিক্রি সই করেন চাভেজ। এতে অব্যবহৃত ও বেআইনিভাবে দখল করে রাখা জমি জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করার অধিকার পায় সরকার। তারপর থেকে সরকার অধিগ্রহণ করে মোট ২৭ লক্ষ হেক্টর জমি। খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয় ১১ লক্ষ হেক্টর। বাকি জমি ব্যবহার করা হয় খামার ও গবেষণাগারের জন্য। বিবিসি-র মতে, এই মুহূর্তে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে 'সমতার সমাজ' ভেনেজুয়েলার। চাভেজের ১৩ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ২২ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৯ শতাংশ। ২০১১ তা কমে হয়েছে ২৭ শতাংশ। চরম দারিদ্রের হার এই সময়ে ২৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.৩ শতাংশ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার গত ১২ বছর ধরে ঐ মহাদেশে সবচেয়ে কম। খাদ্যে আমদানি-নির্ভরতা ৯০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩০ শতাংশ। (*গণশক্তি*, ৯ মার্চ, ২০১৩)

চাভেজ কেবল দেশের মধ্যেই বিরাট পরিবর্তন আনেন নি। মার্কিন নেতৃত্বের চরম উদারপন্থী বিশ্বায়নের পরিবর্তে গণমুখী বিশ্বায়ন তৈরি করতে চেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া FTA (Free Trade of the Americas)-এর বদলে গড়ে তুলেছিলেন ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas)। এটা হয়ত কাকতালীয় যে 'আলবা' কথাটির অর্থ স্পেনীয় ভাষায় ভোর। খনিজ তেল উৎপাদনকারী

দেশগুলির সংগঠনে তিনি ডলারের বদলে ইউরো-কে বিনিময় মুদ্রা করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনও অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছিলেন। এটাই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ইরাক আক্রমণ শক্তির ইরাক আক্রমণ ও সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানোর অন্যতম কারণ ছিল। মারাত্মক অস্ত্রের উপস্থিতির কথা উপকথা মাত্র। চাভেজ লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে তেলের বিনিময় প্রথা চালু করতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল সমাজতান্ত্রিক কিউবার সঙ্গে। ভেনেজুয়েলা কিউবাকে কম দামে (সাবসিডাইজড) তেল দিত ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করত। বিনিময়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যন্ত উন্নত কিউবা প্রচুর ডাক্তার পাঠিয়ে ভেনেজুয়েলার গণস্বাস্থ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। CELEC ছিল লাতিন আমেরিকান-ক্যারিবিয়ান সংগঠন। লাতিন আমেরিকার বাইরেও চাভেজ চীন, রাশিয়া, ইরান ও লিবিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যারা মার্কিন সরকারের খুব প্রিয় নন। সিরিয়া ও ইরানেও ওয়াশিংটন রেজিম চেঞ্জের জন্য মুখিয়ে আছে। চাভেজ ভারতে, কলকাতায়, এসেছিলেন, এটা স্মরণীয়।

একথা বলা হয়, চাভেজের আর এমন কী কৃতিত্ব। তার দেশের মাটির নিচে আসে তরল সোনার ভাণ্ডার। তেল ভেনেজুয়েলায় আগেও ছিল। তাতে আমজনতার ফায়দা হয়নি। চাভেজ পেট্রোলের জাতীয়করণ করেছিলেন। বিদেশি তেল কোম্পানিদের কাছ থেকে পাওয়া রয়ালটি ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করেছিলেন ১৫ শতাংশ। সেই অর্থ সমৃদ্ধ করেছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণের খাত। নিরক্ষরতা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় মুছে ফেলা গিয়েছিল। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদির সূচক হলো ঊর্ধ্বগামী।

তা বলে কি চাভেজের ভেনেজুয়েলায় কোনো সমস্যা ছিল না? ছিল। না থাকলে সেটা হতো প্রায় অলৌকিক কাণ্ড। হিংসাত্মক অপরাধ বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে, বিশেষত রাজধানী কারাকাসে। মুদ্রাস্ফীতির হার ২২ শতাংশ। অবশ্য ২০১০-এ যে ২৭ শতাংশ ছিল, তার তুলনায় কমেছে। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রাস্ফীতি গোটা লাতিন আমেরিকার প্রায় ক্রনিক অসুখ। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণও বেড়েছে। বলিভারিয়ান কারেন্সি বা মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটেছে, ডলারের তুলনায়। এসব দেখিয়ে বিরোধীরা বলিভারিয়ান বিপ্লবের দুর্বলতা তুলে ধরতে চায়। আবৃত রাখে বিপুল সাফল্যের দিকটি। দুর্বলতার কারণ কিছুটা বাম সরকারের ত্রুটি, কিছুটা আন্তর্জাতিক অবস্থা, অনেকটাই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর (এরা এখনও অর্থনীতির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে) সাবোতাজ বা অন্তর্ঘাত।

এদিক থেকে ভেনেজুয়েলা হয়ত ৮০-র দশকের নিকারাগুয়ার সঙ্গে তুলনীয়। তবে চাভেজের আমলে ওয়াশিংটন, যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়াতে পর পর বা একই সঙ্গে আগ্রাসী যুদ্ধে জড়িয়েছিল। লাতিন আমেরিকা নামক ঘরের উঠোনে অতটা নজর দিতে পারে নি। ভেনেজুয়েলা একটু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছিল।

সেই সময়টা হয়ত চাভেজের শেষ নিঃশ্বাসের সাথে শেষ হয়ে আসছে। চাভেজের বাছাই করা উত্তরাধিকারী নিকোলাস মাদুরো একজন প্রাক্তন বাস ড্রাইভার ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। সৎ, র‍্যাডিক্যাল, যোগ্য। তবে চাভেজের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, ক্যারিশমা তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। ১৪ই এপ্রিলের নির্বাচনে সরকারের ফল আশাজনক হয় নি। সব জনমত সমীক্ষা দাবি করেছিল, মাদুরো জিতবেন ১০-২০ শতাংশ ভোটের মার্জিনে। বাস্তবে তাঁর জয় হয়েছে মাত্র লাখ তিনেক ভোটের ব্যবধানে। বিপক্ষ প্রার্থী, মিরান্দা প্রদেশের গভর্নর, এনরিকে ক্যাপ্রাইলেস রদনস্কি (ইনি ২০০২-এর ষড়যন্ত্রে ছিলেন) ভোট পুনর্গণনা দাবি করেছেন। যদিও ভেনেজুয়েলায় ভোটে কারচুপি করা শক্ত। মেশিনে ও কাগজে ভোট গণনা হয়। শতাধিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন অফ সাউথ আমেরিকান নেশন্‌স মিলে ঠিক করেছে, পুনর্গণনা নয়, ভোট অডিট হবে।

এই আপেক্ষিক বিপর্যয়ের কারণ কী? মাদুরো সন্ত্রাস ও সাবোতাজের অভিযোগ এনেছেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে। জলের মতো টাকা ছড়ানো হয়েছে। মধ্য আমেরিকা থেকে গুন্ডা আমদানি করা হয়েছে। ভোট পড়েছে ৭৩ শতাংশ। এটা এমনিতে বেশি মনে হতে পারে। কিন্তু ভেনেজুয়েলায় ভোটদানের হার থাকে ৯০ শতাংশের বেশি। বাকিদের কি ভয় দেখিয়ে বিরত করা হয়েছে? মাদুরোর নির্বাচনী সভাগুলির সময় আগে বিদ্যুৎ উধাও হয়ে যাওয়া কি নিছক কাকতালীয়?

মাদুরো ক্যাথলিক নন। একটি গোঁড়া ক্যাথলিক দেশে এটাও একটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর হতে পারে। চাভেজের সঙ্গে ক্যাথলিক গির্জার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সরকারের যে দুর্বলতাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি হয়ত চাভেজ বিহনে আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

চাভেজ আর নেই। সেই উদ্দীপ্ত, কাউবয় টুপি মাথায়, লোকসঙ্গীত গাওয়া, স্পেনের রাজা ও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চড়া কথা শুনিয়ে দেওয়া 'এল কমান্দান্তে' গত হয়েছেন। চাভিজমোও কি শেষ হয়ে যাবে? সেদিকে তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব।

প্রবন্ধ

নোভার্টিস ও গ্লিভেক :

সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও ভারতের পেটেন্ট ব্যবস্থা

প্রদীপ রায়

কবির চেতনায় এপ্রিল মাস দুঃসময়ের মাস বলে অনুভূত হলেও ভারতীয় ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে এই মাসটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশীয় ভেষজ শিল্পের বিকাশের সূচনাপর্ব যে আইন বলে শুরু হয়েছিল— যা 'ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০' নামে খ্যাত, তার কার্যকর হওয়ার মাস। আবার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত ট্রিপস্ বা প্রযুক্তি বাণিজ্যে মেধাসত্ব ও তৎসংক্রান্ত বিষয়কে মান্যতা দিয়ে সংশোধিত ভারতীয় পেটেন্ট আইনের প্রয়োগও হয় এই মাসে।

সম্প্রতি নোর্ভাটিসের ওষুধ গ্লিভেককে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় ভারতীয় পেটেন্ট আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে কৌতূহলী করেছে। এই কারণেই এই রচনা।

পেটেন্ট মেধাস্বত্বের স্বীকৃতির এক বিশেষ রূপ। এই আইনবলে একটি স্বাধীন দেশ একজন আবিষ্কারককে অথবা তার প্রতিনিধিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাণিজ্য করার অধিকার দেয়, যার ফলে আবিষ্কার-কর্তা ছাড়া অন্য কেউ ঐ আবিষ্কৃত পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া ঐ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুকরণ করে বাণিজ্য করতে পারবে না। এ ব্যবস্থা নিয়ে দেশে বিদেশে বিতর্কের শেষ নেই, কারণ এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু একজন ব্যক্তির/কোম্পানির মেধাস্বত্ব ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পজাত পণ্যের বাজারের পরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে শুরু হয়েছিল শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, ফলত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তির বিকাশের উপর জোর দিতে হয় কারণ উন্নত প্রযুক্তিই যুগপৎ উৎপাদন ব্যয় কমায় ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মানবসম্পদ ব্যবহার করে নতুন নতুন পণ্য, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং তার সাহায্যে বাজার ধরার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। তাই এই সুবিধা একচেটিয়া ভোগ করার অধিকারকে সুনিশ্চিত ও দীর্ঘজীবী করতে পেটেন্ট আইন শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনা ভারতীয় পেটেন্ট আইন ও ওষুধ শিল্পে এর প্রভাবের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

ওষুধ শিল্পে নতুন আবিষ্কারকে একচেটিয়া বাজারজাত করার অধিকার দেওয়া হয় পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে। নতুন আবিষ্কার ও তার জন্য খরচের বহর এবং সেই খরচ ফেরত পাবার জন্য পেটেন্ট— এ নিয়ে অনেক কল্পকথা তৈরি করা হয়েছে। উচ্চমূল্যে ওষুধ বিক্রি করার অধিকারের বিরুদ্ধে যে জনরোষ তৈরি হয় তার মোকাবিলায় ওষুধ কোম্পানিগুলি প্রায়শই যে কথা জাদুমন্ত্রের মতো আওড়ে থাকে তা হলো ব্যয়সাপেক্ষ গবেষণা ও তার দরুণ নতুন উদ্ভাবন। এই ব্যয়বহুল গবেষণার খরচ তোলা এবং আরও গবেষণায় নিয়োজিত থাকার জন্যই নাকি উচ্চমূল্য। এই কল্পকথা তথা মিথের সাথে বাস্তবের মিল কতটা যাচাই করা যাক। ওষুধ কোম্পানিগুলি বার্ষিক বাজেটের সিংহভাগ খরচ করে বিপণন ও পরিচালনা (প্রশাসন) ক্ষেত্রে। এর অল্পাংশ বরাদ্দ থাকে গবেষণা ও উন্নয়নে (আর এন্ড ডি)। আর এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ মোট মুনাফার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

এ বছর রক্তের ক্যান্সারের ওষুধ গ্লিভেক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের বিপক্ষে যাওয়ার দরুন বহুজাতিক নোভার্টিস কোম্পানির শীর্ষকর্তা হুমকি দিয়েছেন যে ভারতবর্ষে গবেষণা ও উন্নয়নখাতে আর কোন খরচ করা হবে না এবং এই কোম্পানি এই কাজের ক্ষেত্র এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেবে। অথচ সেন্টার অফ মনিটারিং অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) জানাচ্ছে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে নোভার্টিস কোম্পানির এদেশে মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ৯৩৩.২৭ কোটি টাকা। নীট মুনাফা ১৪৭.৬০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, আর এন্ড ডি খাতে ব্যয় ছিল মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। আর অন্য কোম্পানির সঙ্গে নোভার্টিসের ওষুধের দামের তফাত ছিল কত? নোভার্টিসের ওষুধ গ্লিভেক (রক্তের ও পেটের ক্যানসার চিকিৎসার ওষুধ) ব্যবহারকারীর মাসিক খরচ ১-২ লক্ষ টাকা, যেখানে দেশীয় কোম্পানি ন্যাটকোর ওষুধ 'ভিনাট্' (একই মূল উপাদান)-এর মাসিক খরচ ৮ হাজার টাকা। এই উচ্চমূল্য ও গবেষণাখাতে খরচের বহরের আপাত অনুপাত একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকারের ন্যায্যতা নিয়ে বহুকথিত গবেষণা ও উদ্ভাবনের গল্পগাথায় বাঁধা পড়ে না।

শক্তিশালী পেটেন্ট ব্যবস্থার স্বপক্ষে গবেষণাখাতে উচ্চখরচের যে তত্ত্ব খাড়া করা হয় তার দিকে নজর দেওয়া যাক।

ইদানিং কালে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে খরা চলছে। Block-Buster (অর্থাৎ যে ওষুধের বিক্রি বছরে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি) ওষুধ নেই বললেই চলে, যা আছে তাদের পেটেন্ট সীমা শেষ হয়েছে বা হতে চলেছে। তাই ইদানিংকালে নতুন ওষুধ যা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয় তা পুরনো ওষুধের রকমফের মাত্র, যাকে এই শিল্পের আঙ্গিনায়

"mee-too" ওযুধ বলা হয়। বর্তমানে রক্তে লিপিড কমানোর জন্য ছয় রকম ওযুধ বাজার জাত করা হয়েছে যেমন লোভাস্ট্যাটিন, অ্যার্চরভাসটাটিন, সিমভোসটাটিন, প্রাভাস্টাটিন, ফ্লুভাস্টাটিন ও রোসুভাস্টাটিন। এই সব ওযুধগুলি প্রথম আবিষ্কৃত ওযুধ লোভাস্টাটিনের প্রকারান্তর। একথা জানিয়েছেন আমেরিকার কাইজার পার্মানেন্টি গ্রুপের অধিকর্তা ডা. শারণ লেভিন।

একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে— ২০০২ সালে আমেরিকার ওযুধ নিয়ামক সংস্থা এফডিএ (Federal Drug Administration) অনুমোদিত ৭৮ টি নতুন ওযুধের মধ্যে কেবলমাত্র ১৭টি ওযুধের মূল কার্যকর উপাদান (Active ingredients) নতুন এবং ৭টি ওযুধ পুরানো ওযুধের প্রকার/আকার ভেদ। এছাড়া আরও ৭১টি ওযুধের অনুমোদন দেওয়া হয় ঐ বছরে যা এফডিএ-র মূল্যায়নে পুরনো ওযুধের রকমফের মাত্র। ১৯৯০ সালে ইউরোপে রোন পেলেঙ্ক ফাউন্ডশনের তরফে পি ব্যারালের একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, ১৯৭৫-৮৯ এই সময়ে যে নতুন ৭৭৫টি নতুন রাসায়নিক পদার্থ বাজারে প্রবেশ করে তার মধ্যে মাত্র ৯৫টি পদার্থ ইনোভেটিভ। ফলে গবেষণা খাতে বহুল খরচের গল্প গল্পতেই শেষ।

গবেষণার ব্যাপারটা অরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। '৮০-র দশকে আমেরিকায় 'বে-ভেল' (দুজন সেনেটারের নাম) আইন দ্বারা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ হেলথ (এনআইএইচ) সংস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকাজে নিয়োজিত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে বিপুল অর্থসাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য বায়োটিক কোম্পানি গড়ে ওঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে একযোগে গবেষণার কাজ শুরু করে। এই গবেষণালব্ধ কাজগুলি বড় বড় ওযুধ কোম্পানি নগদ অর্থে কিনে নেয় এবং তাকে বিক্রয়যোগ্য ওযুধে পরিণত ক'রে পেটেন্ট অধিকার অর্জন করে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে প্রভূত মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ এনআইএইচ (যা প্রকৃত অর্থে সাধারণ মার্কিন নাগরিকের করের টাকা)-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণায় লিপ্ত ছোট ছোট কোম্পানির মেধায় যা আবিষ্কৃত হয় তা ভোগ করে বৃহৎ বহুজাতিক ওযুধ সংস্থাগুলি। অর্থাৎ গবেষণা ও উন্নয়নখাতে 'বহুল খরচে'র জোগান দেয় শেষ বিচারে জনসাধারণ। মুক্ত বাজা নীতির অনুসারে ওযুধ কোম্পানিগুলি কোন বিশেষ ওযুধ তৈরি করার বা তার দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারি প্রভাবমুক্ত অবাধ অধিকার ভোগ করার অধিকার চাইবে, আবার একই সঙ্গে একচেটিয়া বিপণনের আইনি অধিকার অর্জনের জন্য সরকারি আনুকূল্য চাইবে। তথ্য বলে, নতুন ওযুধ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় বিপণনের প্রথম তিন বছরে একচেটিয়া ব্যবসায় সেই টাকা উঠে আসে। পরবর্তী সতেরো বছরে পেটেন্টের মহিমায় কোম্পানিগুলি লাগামছাড়া মুনাফার পাহাড় জমায়।

ভারতবর্ষে পেটেন্ট আইনি ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যার সূচনা ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে— এমনকি আধুনিক পেটেন্টের জনক প্যারিস কন্‌ভেনশনেরও (১৮৮৩) আগে। ব্রিটিশ পেটেন্ট আইন ১৮৫২-র অনুরূপ প্রথম পেটেন্ট আইন (Act of VI) দেশে চালু হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে, উদ্ভাবনকে সুরক্ষিত করার জন্য। তিন বছর বাদে ১৮৫৯ সালে উপরোক্ত আইন পরিবর্তিত হয়, যা Act of XV নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭২ সালে প্রবর্তিত হয় পেটেন্ট ও ডিভাইন প্রটেকশন অ্যাক্ট এবং ১৮৮৩ সালে চালু হয় প্রটেকশন অফ্ ইনোভেশন অ্যাক্ট। এরপর ১৮৮৮ সালে পূর্বের আইনকে শক্তিশালী করা হয় ইনোভেশন ও ডিজাইন অ্যাক্ট মারফত। শেষে ১৯১১ সালে চালু হয় দি ইন্ডিয়ান পেটেন্ট ও ডিজাইন অ্যাক্ট। অল্প সময়ের মধ্যে একাধিকবার পেটেন্ট আইনের পরিবর্তন করা হয় শিল্প বিপ্লব-উত্তর ব্রিটিশ প্রযুক্তিকে একাধিপত্যের অধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই আইনে পণ্য ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে পেটেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, যাতে এদেশের গবেষণা ও শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার পর দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ওযুধ শিল্পের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়, কারণ এই শিল্প সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। ১৯৪৮ সালে বিচারক ড. বক্সী টেকচাঁদের অধীনে পেটেন্ট এনকোয়ারি কমিটি তৈরি হয়; উদ্দেশ্য ১৯১১-র পেটেন্ট আইনের পুনর্বিবেচনা। এই কমিটি প্রস্তাব দেয়: বর্তমান আইন বিদেশি পুঁজির স্বার্থে, বিশেষ করে ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে রচিত। এই আইনে পেটেন্টের অপব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে এবং এই আইনের বলে ওযুধ ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি উচ্চমূল্যে বিপণনের দরুণ তদ্‌জাত সুফল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তাই দেশের স্বার্থবাহী নতুন পেটেন্ট আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫০ সালে ১৯১১-র পেটেন্ট আইন সংশোধিত হয় যাতে উদ্ভাবনের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়, চালু হয় বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং-এর শর্ত। ১৯৫২ সালে ওযুধ, কীটনাশক, জীবানুনাশক ও ছত্রাকনাশকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স চালু করার অবাধ অধিকারের জন্য যে বিল আনা হয় পার্লামেন্টে, শিল্প-সংস্থাগুলির চাপে তা পুনরুত্থাপন ও আলোচনা না করায় পরবর্তীতে তামাদি হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে বিচারক এন রাজাগোপাল আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে দেশের স্বার্থবাহী সুসংবদ্ধ পেটেন্ট আইন তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে, প্রভূত নথিপত্র ঘেঁটে, পূর্বাপর পেটেন্ট আইনে দেশীয় শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব তথ্য-সহ এই কমিটি পেশ করে। সুপারিশ করে : প্রথমত, যে

কোনও দেশের পেটেন্ট আইন তৈরি হওয়া উচিত সেই দেশের গবেষণা প্রযুক্তি ও শিল্পের বাস্তব অবস্থাকে ভিত্তি করে এবং আগামী দিনের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিকে মাথায় রেখে, দ্বিতীয়ত, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পেটেন্ট দান যেন দেশীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিকূল না হয়। তৃতীয়ত, খাদ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্ট দান নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত নয়। চতুর্থত, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো নতুন পেটেন্ট আইন তৈরির ক্ষেত্রে জার্মানির ১৮৭৭ সালে গৃহীত পেটেন্ট আইন মাথায় রাখতে হবে যা রাসায়নিক পদার্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রস্তুতপ্রণালীর উপর পেটেন্ট দানের কথা স্বীকার করে। এরই ভিত্তিতে তৈরি হয় ঐতিহাসিক ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০। এই পেটেন্ট আইনের মূল বৈশিষ্ট্য : ১) খাদ্য ও ওষুধ সহ ২৯টি ক্ষেত্রে পেটেন্ট নেওয়া নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র এদের উৎপাদন পদ্ধতির উপর মেধাসত্ত্ব বা পেটেন্টের স্বীকৃতি দেওয়া হয়; (২) খাদ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্ট দেওয়া হয় পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য, (৩) পেটেন্টের অপব্যবহার রুখতে লাইসেন্সের অধিকার (License of Rights) এবং বাধ্যতামূলক লাইসেন্স দান (Compulsory Licensing)-এর ধারা যুক্ত হয়।

একই সময়ে ভারত সরকারের তরফে একগুচ্ছ নীতি নির্ধারিত হয়। যেমন ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া (ডিপিসিও), বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এদেশে ওষুধের মূল উপাদান (bulk drug) তৈরি করতে বাধ্য করা, বিদেশি কোম্পানীগুলির শেয়ার ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনার বাধ্যবাধকতা ও আমদানির ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ ও উচ্চ শুল্ক ধার্য করা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়াকরণ প্রতিরোধে 'এমআরটিপি' আইন ও বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন 'ফেরা' চালু করা এবং ভেষজ শিল্পে সরকারি উদ্যোগে আইডিপিএল, হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক নামক পাবলিক সেক্টর ইউনিট প্রতিষ্ঠিত করা।

এরই প্রভাবে এদেশের ভেষজ শিল্পে জোয়ার এল। ১৯৪৭ সালে ওষুধ শিল্পের ব্যবসার পরিমাণ ছিল বছরে দশ কোটি টাকা। তা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকা, যার সত্তর শতাংশ দখলে রয়েছে ভারতীয় ওষুধশিল্প প্রতিষ্ঠানের। ১৯৭৫ সালে এদেশে মূল ওষুধ বা বাল্ক ড্রাগের ৬২ শতাংশ এবং তৈরি ওষুধ বা ফর্মুলেশনের ৫০ শতাংশ ছিল বিদেশি। ১৯৮৮ সালে মৌল ওষুধের ৮২ শতাংশ এবং তৈরি করা ওষুধের ৬০ শতাংশ দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদিত হয়। অধ্যাপক সুদীপ চৌধুরীর গবেষণায় জানা যায় যে ১৯৫২ সালে ভারতীয় ওষুধ বাজার বহুজাতিক সংস্থা ও ভারতীয় সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ বাজার দখলের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ৬২, যে অনুপাত ২০০৪ সালে পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে ২৩ ও ৭৭ শতাংশে পৌঁছায়। মার্কিন সেনেটর কেফাউবার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় আইন ১৯৭০ চালু হওয়ার আগে এদেশে অ্যান্টিবায়োটিকের দাম ছিল সারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি। আজ ভারতীয় জীবনদায়ী ওষুধ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন গরিব দেশগুলিতে রপ্তানি করা বহুজাতিক কোম্পানির ওষুধের দামের চাইতে অনেক কম দামে বিক্রি হয়। ভারতকে এখন বলা হচ্ছে Pharmacey Hub। ওষুধ তৈরির বিশ্বের বাজারে মোট উৎপাদনের বিচারে ভারতের স্থান চতুর্থ এবং মূল্যমানে চতুর্দশ। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বাজারের ফর্মুলেশনের ৭৫ শতাংশ, বাল্ক ড্রাগের ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৬৫ শতাংশ ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির দখলে।

বিশ্বের বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য জেনারেল এগ্রিমেন্ট অব ট্যারিফ্‌স এন্ড ট্রেডস বা গ্যাট (GATT) তৈরি হয় ১৯৪৮ সালে, প্রাথমিক ভাবে ২৩টি দেশ নিয়ে। এরই অষ্টম রাউন্ডের আলোচনা, যা উরুগুয়ে রাউন্ড নামে পরিচিত, তাতে নতুন বিশ্ব বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্র পেশ করা হয়েছিল এবং পরিষেবা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও মেধাস্বত্বের মতো নতুন নতুন বিষয়গুলিকে আলোচনায় রাখা হয়েছিল। এ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিতর্ক চলে। কারণ এই বিশ্ববাণিজ্য নীতি প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীন বিকাশ ও নিজের চাহিদামতো পরিকল্পনা করার ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করা হয়। এর চূড়ান্ত আইনি খসড়া পেশ করে গ্যাট-এর ডিরেক্টার-জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল, ১৯৯১ সালে। এই প্রস্তাব বাধ্যতামূলক চুক্তির আকারে এক স্ব-কার্যকরী প্রস্তাবগুচ্ছ। এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশের আইন ও নীতিসমূহ সংশোধন করে। এই প্রস্তাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রযুক্তি বাণিজ্যে মেধাস্বত্ব ও তৎসংক্রান্ত বিষয় বা ট্রিপ্‌স (TRIPS)।

গ্যাটের মারাকাশ চুক্তি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৈরি হওয়ার পর ভারত এতে যোগদানে অনুমতির জন্য আবেদন জানায়। এই যোগাদনের শর্ত ছিল : (১) চূড়ান্ত আইনি সংশোধনের জন্য ১০ বছর সময়সীমা নির্ধারিত হবে; (২) মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বের যে কোনও দেশে পেটেন্টভুক্ত কোন পণ্য ভারতে বিপণনের ক্ষেত্রে সেই পেটেন্ট অধিকারী বা তার প্রতিনিধিকে একচেটিয়া বিপননের অধিকার (exclusive Marketing Rights) দিতে হবে; (৩) পেটেন্ট সংক্রান্ত আবেদন পত্রগুলি গ্রহণ করার জন্য মেইলবক্স (Mail box) বসাতে হবে।

এই শর্তকে মান্যতা দিয়ে ভারতীয় পেটেন্ট আইন তিনদফায়, যথাক্রমে ১৯৯৯, ২০০২ এবং সর্বশেষে ২০০৫ সালে, সংশোধন করা হয়। পরিবর্তিত পেটেন্ট আইনে যা যা পরিবর্তন করা হয় তা হলো : (১) পণ্য ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই পেটেন্ট চালু হলো; (২) বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে পেটেন্ট সীমা

ছিল ৫ বছর থেকে ১৪ বছর, তা বাড়িয়ে ২০ বছর করা হলো; (৩) পেটেন্ট আবেদনকারীর দেওয়া তথ্য গোপন রাখতে হবে; (৪) পেটেন্ট অধিকারীরা আমদানি, ব্যবহার, রপ্তানি ও বিপণনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করবে।

২০০৫ সালে তৃতীয় সংশোধনে ভারতীয় পেটেন্ট আইনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারা যুক্ত হয়: (১) 2(1)(Ja) এবং 3(d)। এছাড়া বিগত পেটেন্ট আইনের ৮৪ ধারা বলবৎ থাকে, যাতে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের ব্যাখ্যা রয়েছে। সংশোধিত পেটেন্ট আইনের এগুলিই শেষ রক্ষাকবচ।

ভারতীয় পেটেন্ট আইনের 2(1)(Ja) ধারায় বলা হয়েছে উদ্ভাবনী ধাপ বলতে বোঝায় এমন কোন উদ্ভাবনী ধারা যা এযাবৎ জ্ঞাত প্রায়োগিক জ্ঞান অপেক্ষা প্রকরণগতভাবে উৎকৃষ্ট অথবা আর্থিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অথবা উভয়ই, এবং যে ব্যক্তি এই উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত তার দক্ষতার সাথে স্পষ্টত সম্পর্কিত নয়।

3(d) ধারায় বলা হয়েছে কোন্টা পেটেন্টের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যথা: (১) একটি প্রচলিত বস্তুর নতুন ধর্ম আবিষ্কৃত হলে এবং তা যদি বস্তুর বর্তমান গুণাবলীর চাইতে উন্নত না হয়; (২) একটি প্রচলিত বস্তুর কেবলমাত্র একটি নতুন ধর্ম অথবা নতুন ব্যবহারিক মূল্য তৈরি হলে; (৩) একটি প্রচলিত পদ্ধতি, বস্তু বা যন্ত্রগুচ্ছ (machine & apparatus) যা কোনও নতুন পদার্থ তৈরি করে না বা ঐ জ্ঞাত পদ্ধতিতে কমপক্ষে অন্তত একটি নতুন বিকারক (Reactant) ব্যবহৃত না হয়।

এই 3(d) ধারা যুক্ত করা হয়েছে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর জুয়াচুরি বন্ধ করতে, যেখানে প্রচলিত বস্তুর সামান্য উন্নতির কথা প্রচার করে নতুনভাবে ২০ বছরের জন্য পেটেন্ট দাবি করা হয়।

নোভার্টিস একটি ইউরোপের বহুজাতিক কোম্পানি যার দুনিয়া জুড়ে বিক্রির পরিমাণ ৫৬.৭ বিলিয়ন ডলার (২.৮ লক্ষ কোটি টাকা)। এর মধ্যে গ্লিভেক নামক ক্যানসারের ওষুধের বিক্রির পরিমাণ ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই গ্লিভেকের (ইমিটানিব মেসাইলেট) পেটেন্ট সীমা ইউরোপে শেষ হবে ২০১৬ সাল। ইতিমধ্যে কোম্পানি উক্ত পদার্থের অর্থাৎ ইমটানিব মেসাইলেটের বিটা-ক্রিস্টালাইন ফর্ম আরও কার্যকর এই দাবি জানিয়ে নতুনভাবে পেটেন্টের আবেদন করে চেন্নাইয়ের পেটেন্ট অফিসে ১৯৯৮ সালে। যেহেতু সেইসময় ভারতের পেটেন্ট আইনে রাসায়নিক পদার্থের উপর পেটেন্ট দেওয়ার নিয়ম ছিল না, সেই আবেদন মেইলবক্সে জমা থাকে। ২০০৬ সালে অর্থাৎ ভারতীয় পেটেন্ট আইনের সংশোধনের পর ঐ আবেদন বিবেচনা করে পেটেন্টের 3(d) ধারায় ঐ ওষুধ যেহেতু নতুন নয়, পুরনোটিরই আধুনিক সংস্করণ মাত্র, তাই পেটেন্ট অফিস সেই আবেদন নাকচ করে। কোম্পানি ঐ একই বছরে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপিল করে, যা একই কারণে খারিজ হয়ে যায়। এরপর নোভার্টিস ২০০৭ সালে Intellectual Property Appellate Board (IPAB)-র কাছে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে, এবং একই কারণে তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর ২০০৯ সালে কোম্পানি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এবং দীর্ঘ শুনানির পর সুপ্রিমকোর্ট ২০১৩ সালের পয়লা এপ্রিল ১১২ পাতার দীর্ঘ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ সহ রায়ে ঐ আপিল খারিজ করে দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঐতিহাসিক। কারণ ঐ রায়ে 3(d) ধারার যৌক্তিকতা মান্যতা পেয়েছে, যা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের কাছে পথপ্রদর্শক হিসাব কাজ করবে এবং ঐ ধারা বলে আগামী দিনে একই যৌগের পেটেন্ট সীমা সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্ধিত করার যে প্রক্রিয়া, যা 'এভারগ্রিনিং' (evergreening) নামে পরিচিত, তা ঠেকানো যাবে এবং উচ্চমূল্যের পেটেন্টভুক্ত ওষুধ অনেক কম দামে রোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রোগাক্রান্ত মানুষ/স্বাস্থ্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও সক্রিয় কর্মীরা এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে।

ট্রিপস সঙ্গতিপূর্ণ সংশোধিত ভারতীয় পেটেন্ট আইনের ধারা 3(d) এবং বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং এর বিধান দেশের ওষুধশিল্প স্বার্থে রক্ষাকবচ। বহুজাতিক ওষুধকোম্পানিগুলি উন্নত দেশগুলির সরকারের মাধ্যমে ভারতের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে ঐ দুই ধারাকে বাদ দেওয়ার জন্য। দেশে ঐ কোম্পানিগুলোর মুখপাত্র ওপিপিআই (Organisation of Pharmaceutical Producers of India) ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একাধিক ডেপুটেশন দিয়েছে। এছাড়া ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে যে আলোচনা চলছে তাতেও যুক্ত হয়েছে এমন কিছু শর্ত যা ট্রিপসের শর্তের চাইতেও কঠোর। এতে পেটেন্ট সীমা আরও বাড়ানো, এভারগ্রিনিং-এর মান্যতা, তথ্য স্বাতন্ত্র্য (exclusivity), মুক্ত প্রতিযোগিতা, সরকারি সংগ্রহে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে দেশীয় কোম্পানির সমান সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি শর্ত আরোপ করা হচ্ছে।

আগামী দিনে এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র

১) সুপ্রিম কোর্টের রায় নোভার্টিসের গ্লিভেকের আপিল
২) Reintroduction of Pharmaceutical Product Patent Protection and Pharma Industry in India– Prof. Sudip Chowdhury, Prof. MMC

প্রবন্ধ

নতুন মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র : ড্রোন

মিতা দত্ত

কিছুদিন ধরেই একটা শব্দ চারপাশে ভন্‌ভন্ করছে। রাজনৈতিক পরিভাষার অঙ্গ হয়ে উঠছে। ড্রোন। শব্দটির একটা অর্থ পুরুষ মৌমাছি বা ভন্‌ভন্ করা হলেও বর্তমানে যে অর্থটি নিয়ে আমরা চিন্তায় সেটি হলো 'মানববিহীন বিমান'— আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল বা ইউএভি। আকারে এগুলি সাধারণ বিমানের চেয়ে অনেক ছোট, আর বিমানের মধ্যে মানুষ থাকে না। দূর থেকে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই সংবাদে আসছে ড্রোন হানার ঘটনা। প্রতিটি নির্দিষ্ট ঘটনা তেমন বিশাল নয় বলে আর নিহতরা সাদা চামড়ার না হওয়ায় এই সংবাদগুলি তেমন সোরগোল তোলে না। আসলে কিন্তু ড্রোন হানার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিষয়টি আলোচনা, শুধু আলোচনা কেন, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ দাবি করে। কিন্তু আজকের কর্পোরেটায়িত বিশ্বের মালিকরা এই আলোচনা চান না। কর্পোরেট-মিডিয়া এই আলোচনা করবে না। কারণ, আক্রমণগুলো করছে সিআইএ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্র এ বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করত। কিন্তু ক্রমশ বিষয়টি সামনে এসে যাচ্ছে। বিশেষ করে এমাসের (এপ্রিল, ২০১৩) গোড়ায় ড্রোন নিয়ে সিআইএ-পাকিস্তান গোপন চুক্তির সংবাদ বিষয়টাকে খুব জোরালোভাবে সামনে এনেছে।

সিআইএ-পাকিস্তান গোপন চুক্তি:
বিকিয়ে দেওয়া হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

সাংবাদিক মার্ক মাজেটের একটি নতুন বই বের হলো কয়েক দিন আগে। সেই বইয়ে বেশ কিছু মার্কিন ও পাকিস্তান অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে পাকিস্তান সরকার ও সিআইএ-র মধ্যে একটি গোপন চুক্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালের সেই গোপন চুক্তিতে স্থির হয়, পাকিস্তান সরকারের গলার কাঁটা কিছু 'সন্ত্রাসবাদী'-কে সিআইএ ড্রোন দিয়ে হত্যা করবে, আর তার বিনিময়ে সিআইএ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ড্রোন ঢোকানোর স্বাধীনতা পাবে।

অবশ্য, পাকিস্তানি পক্ষ দাবি করেন, প্রতিটি ড্রোন হানার আগে তাঁদের অনুমতি নিতে হবে। আর, ড্রোন হানা দেওয়া যাবে শুধুমাত্র উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। দেশের অন্যত্র নয়।

ভয়ানক এক চুক্তি। প্রথমত, এতে পাকিস্তান অন্য একটি দেশকে অনুমতি দিল তাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে তাদের দেশের আকাশে গুপ্তচরবৃত্তি করার, হত্যা করার। জাতিসংঘের এই বিষয়ক কমিটির প্রধান বেন ইমারসনও বলেছেন, পাকিস্তানে সিআইএ-র ড্রোন হানা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করছে। দ্বিতীয়ত, এতে একটি সরকার ও সিআইএ স্থির করলো, বিনা বিচারে কিছু মানুষকে হত্যা করা হবে। তৃতীয়ত, এতে পরিষ্কারভাবে স্থির করা হলো যে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ শুধু গুপ্তচরবৃত্তি করবে না, সরাসরি খুনও করবে। কখনো একজন, কখনো অনেক মানুষ হত্যা।

চুক্তিতে ঠিক হয় যে ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন থাকবে। কাজটি করবে সিআইএ-এর গোপন কাজকর্মের বিভাগ ('কভার্ট অ্যাকশন অথরিটি')। অর্থাৎ মার্কিন সরকার ঘটনাটি স্বীকার করবে না। পাকিস্তান সরকার ঘটনাটি ঘটানোর দায়িত্ব নিতে পারে, তার জন্য গর্ব করতে পারে, বা চুপ করে থাকতে পারে।

এই গোপন চুক্তির সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল মুসারফ। কয়েক দিন আগে সিএনএন-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল মুসারফ সিআইএ-কে পাকিস্তানের অভ্যন্তরের উপজাতীয় এলাকায় ড্রোন আক্রমণের অধিকার দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন— ''মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে লক্ষ্যবস্তু একেবারে আলাদা করা সম্ভব, অন্যদের ক্ষতি (কোল্যাটারাল ড্যামেজ) হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ... যখন আমাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনীর আক্রমণ করার মতো সময় নেই''।

গুপ্তচর ড্রোন, খুনে ড্রোন

প্রথমে ড্রোন কী, কীভাবে সেগুলি কাজ করে তা নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

আগেই বলেছি, ড্রোন হলো মানববিহীন ছোট বিমান (বা, উড়তে পারে এমন রোবট)। আকারে ছোট। একটি পতঙ্গের মতো থেকে শুরু কয়েকজন মানুষ মিলে বয়ে নিয়ে যেতে পারে, এরকম। মানববিহীন, অর্থাৎ এই বিমানের মধ্যে কোনও মানুষ থাকে না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো স্বয়ংক্রিয় নয়, নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে সক্ষম নয়। দূরে অবস্থিত কম্পিউটারে বসে কোনো মানুষই এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আগে ড্রোন ব্যবহার করা হতো খবর সংগ্রহ করার কাজে, গুপ্তচরবৃত্তির কাজে। ড্রোনে থাকে ক্যামেরা, সেই ক্যামেরা লক্ষ্যবস্তুর খুব কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুলে আনে। যুদ্ধের সময় এবং অন্যসময়েও গোপনে অন্য দেশে গিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার হতো ড্রোন। এই ব্যবহার এখনও আছে, এবং দিন দিন তা বাড়ছে। তবে তার সাথে এখন নতুন যোগ হয়েছে খুনে ড্রোন ('প্রিডেটর')। এদের সঙ্গে থাকে মিসাইল। প্রয়োজনবোধে সেই মিশাইল দিয়ে ড্রোন থেকে হত্যা করা যায় কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা বেশ কিছু ব্যক্তিকে মেরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়।

ড্রোনের বিশেষ সুবিধা হলো, আকারে ছোট হওয়ায় আক্রান্ত দেশ, বা ব্যক্তি, বা মানুষরা জানতে পারে না কী ঘটছে। রাডারে ধরা পড়ে না, বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র আক্রমণ করে না, অথচ এগুলি বেশ কাছে গিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি বা হত্যার কাজটি করে আসে।

আরও বড় সুবিধা হলো, এতে দামী মার্কিন সেনা মারা যায় না। মার্কিন দেশে রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

আর সবচেয়ে সুবিধা হলো, পুরো ব্যাপারটাই গোপন থাকে। সিআইএ-র কাজকর্ম তো গোপনই। আর মার্কিন সেনাবাহিনী নয়, সিআইএ এই কাজগুলি করে বলে মার্কিন রাষ্ট্র এই ঘটনাগুলি

সরকারিভাবে স্বীকারই করেন না— যদিও সম্প্রতি মার্কিন সরকার ড্রোনের বিষয়টি কিছুটা স্বীকার করছেন।

শুরুর কথা: ভিয়েতনাম ও তার পর

সাধারণভাবে সবার জানা না থাকলেও ড্রোন কিন্তু খুব নতুন আবিষ্কার নয়। এটা ঠিক যে দিন দিন এই অস্ত্র আরো মারাত্মক হচ্ছে, নতুন নতুন ধরনের ড্রোন সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানববিহীন ছোট বিমান বা উড়ন্ত রোবট ড্রোন ব্যবহৃত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে, ১৯৬৪ সালে, ভিয়েতনামে। ব্যবহার করেছিল সিআইএ— বাম্বল বি মিশন। ছোট ছোট গুপ্তচর ড্রোন দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন ঘাঁটি থেকে উড়ে গিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে গুপ্তচরবৃত্তি করে ১৭শ প্যারালালের দক্ষিণ দিয়ে ফিরে আসত। শুধু ভিয়েতনাম নয়, ড্রোন ব্যবহার হয়েছে লাওসেও। দু ধরনের ড্রোন ভিয়েতনামে হানা দিত। নিচু দিয়ে (২০০-২০০০ ফিট) উড়ে যাওয়া, আর উঁচু দিয়ে (৫০,০০০ ফুট উপর দিয়ে) উড়ে যাওয়া। উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া ড্রোনগুলো সাধারণভাবে পুরো এলাকার ছবি তুলত, তবে সে ছবির মান তত ভালো হতো না। নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া ড্রোনগুলি বিশেষ বিশেষ এলাকার উচ্চ মানের ছবি তুলে আনত। কিছু ড্রোন আবার ওড়ানো হতো অন্য বড় বিমান থেকে। বড় বিমানটি থাকত দূরে, শত্রুর বিমান-ধ্বংসী কামানের আওতার বাইরে। কাছে গিয়ে কাজ করে আসত ড্রোন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ড্রোন মোটামুটি ৩৪০০টি মিশন সম্পন্ন করেছিল বলে জানা যায়।

এর পর ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হলো। ড্রোনের ব্যবহার কমে গেল। অনেক দিন ধরে ড্রোনের নতুন বিকাশও বন্ধ থাকল। তবে রোবট নিয়ে কাজ বন্ধ ছিল না। নতুন নতুন ধরনের রোবট তৈরি হতে থাকল। কখনো শিল্পের প্রয়োজনে, কখনো সামরিক প্রয়োজনে, কখনো মহাকাশযাত্রা, ডাক্তারি বা অন্য পরিষেবার প্রয়োজনে।

১৯৮৯ সালে তৈরি হলো 'চেঙ্গিস'। পতঙ্গের মতো এক রোবট যে কোনো ধরনের পরিবেশে সেটি মানিয়ে নিতে পারে, বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উড়ে যেতে পারে। এক একটি চেঙ্গিস খুব সাধাসিধে ক্ষমতার হলেও এরকম ড্রোনের একটি বাহিনী প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।

১৯৯৫ সালে মার্কিনরা তৈরি করল RQ-১। বলকান যুদ্ধে এগুলি ব্যবহৃত হয়, সংবাদ সংগ্রহের জন্য। ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও এর থেকে ড্রোনের অসীম ক্ষমতার আভাস পাওয়া গেল।

অদূর ভবিষ্যতে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনায় উল্লসিত মার্কিন কংগ্রেস ২০০০ সালেই একটি বিল আনে, যাতে বলা হয়েছিল যে যেসব বিমান অন্য দেশে হানা দেবে ২০১০ সালের মধ্যে তার এক-তৃতীয়াংশই হবে মানববিহীন ড্রোন।

কংগ্রেসের সবুজ সংকেত পেয়ে উদ্যোগ আরো বাড়লো। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম খুনে 'প্রিডেটর' ড্রোন পরীক্ষা করা হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। ২০০১ সালেই RQ-৪ (গ্লোবাল হক) পাড়ি দিল প্রশান্ত মহাসাগর। অন্যদিকে শুরু হলো ড্রোনকে সশস্ত্র করার উদ্যোগ। তৈরি হলো MQ-১— এগুলি ক্ষেপণাস্ত্র (হেল-ফায়ার মিশাইল) ছুঁড়তে পারে। আবার, তৈরি হয়েছে *র‍্যাভেন*। হাতে করে ছোঁড়া যায় এগুলি। কাছাকাছি ঘাঁটি থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলে খবর সংগ্রহের কাজে এগুলি দারুণ কাজের।

আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান

২০০১ সালেই আফগানিস্তানের আকাশে উড়ল ড্রোন। গুপ্তচর ড্রোন এবং সশস্ত্র ড্রোন। এখানে মনে রাখা ভালো, আফগানিস্তানের তখন বিমানহানার বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই ছিল না। ২০০২ সালে ড্রোন হানা আরও বাড়লো।

২০০২ সালে ইরাকেও খুনে ড্রোনের হানা শুরু হলো। নতুন ধরনের এক খুনে ড্রোন এলো যারা আকাশ থেকে আকাশে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে পারে। এমন একটি ড্রোন ইরাকের একটি বিমানের পিছু পিছু গোপনে হানা দিয়ে প্রথম বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়লো। সেবার অবশ্য মিশাইলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং ইরাকি বিমানটির পাল্টা হানায় সেটি ধ্বংস হয়।

ড্রোন হানা চলতে থাকে। ২০০৭ সালের মধ্যে তারা মোট আড়াই লক্ষ ঘন্টা উড়েছে। ২০১১ সালে উড়ানের মোট সময় দাঁড়ালো ১০ লক্ষ ঘন্টারও বেশি।

পাকিস্তানে ড্রোন হানা

২০০৪ সালের জুন মাসে পাকিস্তানে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের এক পাখতুন নেতা নেক মুহাম্মদ নিহত হন। তার কয়েক ঘন্টা আগেই তিনি ফোনে এক রিপোর্টারকে জানান যে অদ্ভুত একটা ধাতব পাখি তাঁর কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। এর ২৪ ঘন্টা পর তাঁর বাড়ির মধ্যে একটি মিশাইল হানায় তিনি নিহত হন। সাথে মারা যায় দুটি ছেলে। একজনের বয়স ১০, আরেকজনের ১৬। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জানান যে এই আক্রমণ তাঁদের কাজ। কিন্তু সেটি ছিল নিছক মিথ্যা কথা। এ ঘটনাটি আসলে ছিল পাকিস্তানের মাটিতে সিআইএ-এর ড্রোনের প্রথম হত্যাকাণ্ড। জেনারেল মুসারফ-এর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকারের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে এক গোপন চুক্তির অংশ হিসাবে এই হত্যাটি করা হয় পাকিস্তান সরকারেরই অনুরোধে। কারণ কার্যত নেক মুহাম্মদ হয়ে উঠেছিলেন ঐ অঞ্চলের সর্বেসর্বা, পাকিস্তান সরকারের চাইছিল তাকে সরিয়ে দিতে।

পাকিস্তানই যে মার্কিন ড্রোন হানার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র তা নয়, তবে তা হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু (পড়ুন, মানুষ) হত্যার সবচেয়ে বড় গবেষণাগার। হত্যাকারী থাকে হাজার হাজার মাইল দূরে, লক্ষ্যবস্তুর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। আর এই হত্যার জন্য কোনো আদালতে কোনো প্রাণদণ্ডের আদেশের দরকার নেই, কোনো দেশের জনগণকে কিছু জানানো দরকার নেই। শুধু ইচ্ছেমতো একটি বা কয়েকটি মানুষকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়া। মনে রাখতে হবে, এ সময় কোনো ঘোষিত যুদ্ধ চলছিল না। তথাকথিত শান্তির সময়ে চলছে এই হত্যাকাণ্ড।

আফগানিস্তান, ইয়েমেন, উগান্ডা, সোমালিয়া, লিবিয়া, ইরান

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ছাড়াও ইয়েমেন, সোমালিয়া, উগান্ডায় চলছে ড্রোন হান। ইয়েমেনে হানা শুরু হয় ২০০২ সালে। এই দশ বছরে সেদেশে ড্রোন হানার ঘটনা অন্তত ৪৩। মৃতের সংখ্যা

তিনশোর কাছাকাছি। শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৯-১০ জন।

সোমালিয়ায় মার্কিন ড্রোন হানা শুরু হয়েছে ২০০৭ সালে। এপর্যন্ত হানার সংখ্যা ৩-৯। নিহতের সংখ্যা ৭-২৭। তার মধ্যে অসামরিক ব্যক্তি আছেন প্রায় ১৫ জন। একটি হিসাব অনুসারে, ২০০৭ সাল থেকে গড়ে প্রতিদিন অন্তত একটি ড্রোন সোমালিয়ার আকাশে উড়ে বেরিয়েছে। গ্লোবাল হক, ফায়ার স্কাউট, স্ক্যান ঈগল, র‍্যাভেন। নানা ধরনের ড্রোন। ২০১১ সালে তো এই অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলির কাছাকাছি অন্তত ৮টি ড্রোন ভেঙে পড়ে।

২০০৬ সালে ইরাকে আল-কায়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে কথিত এক সংগঠনের নেতা আবু মুসাব আল-জারদারিকে খুঁজে বের করা হত্যা করা হয়।

২০১১ সালে, লাদেন হত্যার ৪ মাস পর, ইয়েমেনে আল কায়দার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সংগঠনের আনওয়ার আল আওলাকিকে হত্যা করে একটি খুনে ড্রোন। খুব সম্প্রতি লিবিয়ায় যখন গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, তখন লিবিয়ার আকাশেও দেখা দেয় মার্কিন ড্রোন।

ইরানে মার্কিন ড্রোন হানার কথা স্পষ্ট হয় যখন ইরানের সামরিক বাহিনী একটি RQ-১৭ সেন্টিনেল ড্রোন আটক করে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এইরকম কোনো ড্রোনের অস্তিত্ব স্বীকারই করে না।

২০১২ সালে উগান্ডার পাঠানো হয় খুনে প্রিডেটর ড্রোন। কাজ ছিল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লর্ডস রেসিস্ট্যান্স আর্মির প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ কোনিকে খুঁজে বের করতে উগান্ডা সরকারকে সাহায্য করা।

পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিন ড্রোন হানার ঘাঁটি ছিল সোমালিয়ার উত্তরে জিবুতিতে। এখন ঘাঁটির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ইথিওপিয়ায় গন্ডগোলের সুযোগে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষক বাহিনীর পাশাপাশি সিআইএ ঢুকে রাজধানী মোগাদিসু-র আন্তর্জাতিক ওয়ারপোর্টের কাছের জঙ্গলে একটা বিমানঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছে।

কত হাজার মরলে...

কত বড় ঘটনা এই ড্রোন হানা?

আগেই বলেছি ২০০৭ সালের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ১০ লক্ষের বেশি ঘন্টার উড়ান সম্পন্ন করছে। তার পরে তো দিন দিন ড্রোনের ব্যবহার আরো বাড়ছে। শুধু পাকিস্তানেই ২০০৪ সালের পর থেকে ৩৬৬টি ড্রোন আক্রমণ ঘটেছে। তাতে মারা গেছেন ৩৫০০ মানুষ। শেষ আক্রমণটি ঘটেছে ১৪ এপ্রিল (২০১৩), পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান উপজাতীয় এলাকায়। মারা গেছেন ৪ জন।

পাকিস্তানে ড্রোন হানায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অসামরিক ব্যক্তির সংখ্যা চারশোর বেশি। নিহত শিশু দেড়শোর বেশি।

আফগানিস্তানে শুধু গত বছর ড্রোন আক্রমণ ঘটেছে ৪৪৭টি। তাতে মারা গেছেন কয়েক হাজার মানুষ। গত বছরের এই আক্রমণ সংখ্যার বিচারে তার আগের আট বছরের মোট আক্রমণের চেয়েও বেশি। পেন্টাগন সূত্রের খবর, আফগানিস্তানে ড্রোন হানা আরও বাড়বে। ইয়েমেনে, সোমালিয়ার মৃতের সংখ্যা তো আগেই বলেছি।

মৃতের সংখ্যার চেয়েও বড় কথা, এগুলো হচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই, কোনো আদালতে মৃত্যুদণ্ড ছাড়াই।

ড্রোন হানার আরও একটা দিক উল্লেখযোগ্য। আজকাল সবাই ভাবেন, উন্নত প্রযুক্তির ফলে শুধুমাত্র লক্ষ্যবস্তুটির উপর হানা দিয়ে দু-চার জন আল কায়দা বা তালিবানকে খতম করা হয়। তাই ব্যাপারটা বেআইনি হলেও সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা নিয়ে চোখের জল ফেলার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। ড্রোন হানায় বিপদ কাটে শুধু আক্রমণকারীর, কারণ সে হাজার হাজার মাইল দূরে কম্পিউটারে বোতাম টিপছে। কিন্তু উন্নত অস্ত্রের কারণে শুধু দু-একজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়, এটা সর্বৈব মিথ্যা। শিশু হত্যার কিছু হিসাব তো আগেই দিয়েছি। তাছাড়া, কে সন্ত্রাসবাদী আর কে সন্ত্রাসবাদী নয় সে সিদ্ধান্ত নেয় সিআইএ বা সিআইএ-র বন্ধু দেশের সরকার। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রগুলি যে সবসময় নির্ভুল আঘাত হানে সেটিও সত্য নয়। তাছাড়া, লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করতে না পারলে অনেক সময় মিশাইল দিয়ে একটি বাড়ি, একটি গাড়ি বা একটি বাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়— সেখানে নিহত সবাই সন্ত্রাসবাদী এমন অভিযোগ সিআইএ-ও করে না। পাকিস্তানে কয়েক ডজন ঘটনা ঘটেছে যেখানে ড্রোন হানার শিকার মানুষদের যারা উদ্ধার করতে এসেছেন তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। ''এটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে রেডক্রশের ওপর আক্রমণ করা।''

দু-একটা ঘটনার কথা বলা যাক। ১৬ মে, উত্তর ওয়াজিরিস্তান, পাকিস্তান। স্থানীয় সাংবাদিক মুস্তাক ইউসুফজাই জানিয়েছেন, খাইসোর গ্রাম কিছু তালিবান সন্ত্রাসবাদী জমা হয়। স্থানীয় মসজিদে প্রার্থনা করার পর তার মার্কিন বাহিনীর দিকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু তার আগেই মার্কিন ড্রোন এই বাহিনীর উপর মিশাইল আক্রমণ করে। অন্তত এক ডজন লোক মারা যান। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তারপর যখন মৃত ও আহতদের সরিয়ে আনতে যান তাদের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়। মোট ২৯ জন প্রাণ হারান। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী, এদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন নিরীহ গ্রামবাসী। সাবির, ইকরম, মোহিব, জাহিদ, মাশাল ও সৈয়দ নুর। ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দু বছরে পাকিস্তানে উদ্ধারকারীদের ওপর এরকম আক্রমণের অন্তত ১৫টি ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, এপি, এবিসি নিউজ ও আল জাজিরায়।

উদ্ধারকারীদের ওপর আক্রমণ ছাড়াও আছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানকারীদের উপর আক্রমণ। উল্লেখ করা যায় পাকিস্তানে একজন মধ্যস্তরের তালিবান কম্যান্ডার খোয়াজ ওয়ালি মেহসুদ হত্যার কথা। সিআইএ তাকে হত্যা করে। তাদের পরিকল্পনাই ছিল মেহসুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ওপর নজর রেখে আরো বড় তালিবান নেতা বাইতুল্লা মেহসুদকে হত্যা করা। এ কথা জানিয়েছেন পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিক জবি ওয়ারিক (দ্য ট্রিপল এজেন্ট)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ড্রোন হানায় মারা যান ৮৩ জন, তাদের মধ্যে ৪৫ জন অসামরিক মানুষ, ১০ জন শিশু। বাইতুল্লা

মাহসুদকে অবশ্য সেবার হত্যা করা যায় নি।

পাকিস্তানি বাহিনীর এক ব্রিগেডিয়ার জানিয়েছেন, অন্তত একটি ড্রোন হানার ক্ষেত্রে: "আমি বসেছিলাম যেখানে আমাদের বন্ধুরা বলেন যে ওরা সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করছে, আর আমি জানি যে তার নিরীহ মানুষ।" ঐ হানায় যারা প্রাণ হারায় তাদের মধ্যে এক-দুজন তালিবান থাকতে পারে, "কিন্তু তাতে কি ড্রোন হানায় ৪২ জন মূলত নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করাটা ন্যায় হয়ে যায়?"

এই ব্রিগেডিয়ারের আরও মন্তব্য: ড্রোন হানায় রণকৌশলগত কিছু সুবিধা হলেও দীর্ঘকালীন বিচারে তা কোনো সুবিধা দেয় না— "নিরপরাধ ব্যক্তিরা যখন মারা যায়, তখন আরও অনেক লোক তোমার বিরুদ্ধে চলে যায়"।

আগেই বলেছি, সরকারিভাবে ড্রোন হানা অস্বীকার করলেও আজকাল মার্কিন সরকার এটা আর অত গোপন রাখছেন না। ১৯ ফেব্রুয়ারি সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম বলেছেন: "আমরা ৩৭০০ জনকে হত্যা করেছি। কখনো কখনো নিরীহ লোকও প্রাণ হারায়।"

ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান: তফাত নেই

একটা ধারণা চলিত আছে যে বাবা বুশ আর খোকা বুশ, অর্থাৎ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টরাই রক্তলোলুপ; আর ডেমোক্র্যাটরা— ক্লিন্টন থেকে ওবামা, বিশেষ করে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ওবামা— শান্তির পক্ষে। ড্রোন হানার ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোনো ফারাক পাওয়া যাচ্ছে না।

আগেই বলেছি, পাকিস্তানে ড্রোন হানা শুরু হয় ২০০৪ সালে। এ নিয়ে গোপন চুক্তিটা হয়েছিল বুশ আমলে, আর কাজ শুরু ও জোরদার হয় ওবামার আমলে।

আফগানিস্তানে ড্রোন হানা শুরু হয় ২০০১ সালে। কিন্তু সেই আক্রমণ সবচেয়ে জোরদার হয়েছে, ওবামার আমলে। গত বছরে আফগানিস্তানে ড্রোন হানার সংখ্যা তার আগের আট বছরের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি।

এখানে একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার। ২০০৪ সালে আবু ঘ্রাইব ও অন্যান্য জেলে বন্দীদের ওপর মার্কিন অত্যাচারের খবর সামনে আসে। তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থির করে যে এই ধরনের জেল বন্ধ করে দিতে হবে। এমনিতেই বন্দী করা, তাদের বিরুদ্ধে মামলা সাজানো, সুরক্ষিত জেলে ভরে রাখা— নানান হ্যাপা, অনেক খরচ। তারপর আবার সংবাদমাধ্যমের জ্বালা। এর চেয়ে বরং ড্রোন দিয়ে একেবারে মেরে ফেলা ভালো। সিআইএ-র গোপন বাহিনী কাজটা করবে, সরকার স্বীকারও করবে না। এসময় ক্ষমতায় এসেছেন ওবামা। তাই বলা যায়, তিনিই এই প্রকল্পের প্রধান হোতা।

ড্রোন হানায় প্রতিটি হত্যার পর ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকানদের উল্লাসও দেখা গেছে একই রকম।

সিআইএ কর্তৃক হত্যা নতুন নয়। এর আগে ১৯৭৫ সালে ডেমোক্র্যাট সেনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চের নেতৃত্বে একটি কমিটি সিআইএ কর্তৃক বিদেশি নেতাদের খুনের প্রচেষ্টা সর্বসমক্ষে আনেন, আর প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

কিন্তু সে দিন আর নেই। বিশেষত ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পরে (৯/১১) সিআইএ কোথায় কাকে খুন করলো তা নিয়ে আমেরিকা আর চিন্তিত নয়। মারি অরি পারি যে কৌশলে।

মার্কিন দেশের নিজের আকাশও ড্রোন মুক্ত নয়। মার্কিন সরকার বেশ কয়েক বছর ধরেই নিজের দেশের আকাশেও ড্রোন ব্যবহার করছেন। এই সংখ্যা অনেক বাড়বে। তার জন্য দেশের মধ্যে ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

আমাদের ভারতবর্ষ

যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপারে ভারত পিছিয়ে নেই। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব দেশ মিলে মোট যত অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করছে তার ৭ শতাংশ করেছে এই দেশ। জানা গেছে, ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারত মোট ২০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করবে আর তার বড় অংশটাই ব্যয় হবে ড্রোন কিনতে।

১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় আর ২০০২ সালে পার্লামেন্ট হাউস আক্রমণের ক্ষেত্রে দেশের গুপ্তচর বাহিনী দারুণ সমালোচনার মুখে পড়ে। তারপর ভারতীয় সামরিক বাহিনী ১০০টির বেশি ড্রোন কেনে। বেশিরভাগই ইজরায়েলের তৈরি। সার্চার, হেরন— গুপ্তচরবৃত্তিতেই এগুলোর ব্যবহার। এগুলোর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখাই এখন অনেক অনেক ড্রোন কিনতে চায়। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদাধিকারীরা মনে করেন যে ভারতের পশ্চিমে পাকিস্তান সীমানায়, উপকূল প্রহরায় এবং ভারতের কেন্দ্রস্থলে মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রহরার জন্য ড্রোন প্রয়োজন। তাছাড়া, পাকিস্তান ড্রোন কিনছে। শুধু তাই নয়, চীনের সঙ্গে মিলে ড্রোন তৈরিরও চেষ্টা করছে। সুতরাং, ভারতের এখন অনেক ড্রোন চাই।

ভারতের ড্রোন কেনা অনেকটাই ইজরায়েল থেকে। হার্পি, হার্পির উন্নততর রূপ হ্যারপ। এই খুনে ড্রোনগুলি একবার মাত্র ব্যবহার করা যায়। লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। এখন ভারত চাইছে বারবার ব্যবহার করা যায় এমন ড্রোন।

ইজরায়েল থেকে কেনার পাশাপাশি ভারত এখন ড্রোন তৈরিতেও মন দিয়েছে। সরকারি সংস্থা ডিআরডিও ও কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এ নিয়ে কাজ করছে।

ডিআরডিও তৈরি করেছে লক্ষ্য ও নিশান্ত। এগুলি সবই বারবার ব্যবহার করার মতো ড্রোন। নিশান্ত-এর কোনো চাকা নেই। রানওয়ে লাগবে না, একটা ট্রাকে করেই বহন করা যাবে, সেই ট্রাক থেকেই ওড়ানো যাবে। টানা সাড়ে চার ঘন্টা উড়তে পারবে এটি।

ইজরায়েলের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে মাঝারি উচ্চতায় ওড়ার ড্রোন রুস্তম, ছোট উড়ানের উপযোগী পবন ও গগন। রুস্তম তৈরি করতে গবেষণা সহ খরচ পড়েছে ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এটি খুনে ড্রোন হিসাবেও কাজ করতে পারে। পবন তৈরিতে লেগেছে ৩.৩ কোটি মার্কিন ডলার। আর গগন-এর জন্য ৫.৫ কোটি মার্কিন ডলার।

এর পর ৩২ পৃষ্ঠায়

শাহবাগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও গতিপ্রকৃতি

বদরুদ্দীন উমর

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে ৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার শাহবাগে শুরু হওয়া আন্দোলন বাঙলাদেশের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক ঘটনা। প্রথমেই এর দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই অপরাধীরা সকলেই বেসামরিক লোক। এর মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কোনো লোক নেই। সে সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত কোনো বাঙালি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করেনি। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সকল অপরাধীই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। তাদের বিচার এখানে হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এই বিচার ১৯৭২-৭৩ সালের পরিবর্তে শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ৪২ বছর পর। এ দুটি বিষয়কে হিসাবের মধ্যে না রাখলে এ আন্দোলনের কোনো সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

পাঁচই ফেব্রুয়ারির এই আন্দোলন প্রধানত জামায়াতে ইসলামীর যুদ্ধাপরাধী সদস্য এবং জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হলেও অঘোষিতভাবে এটা ছিল বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত। কাদের মোল্লা নামে একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী, যে ঢাকার মিরপুর এলাকায় কয়েকশো নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্য দায়ী, তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া থেকেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। আন্দোলনকারী ও সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে প্রকাশ্য এবং গোপন আঁতাতে অভ্যস্ত আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক গোপন আঁতাতের মাধ্যমেই কাদের মোল্লাকে মত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বিএনপি এবং জামায়াতের জোটগত নির্বাচনী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে জামায়াতকে বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তকেই জনগণ কাদের মোল্লার লঘুদণ্ডের কারণ মনে করেছিলেন। কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়-বিরোধী আন্দোলনকারী ও জনগণের এই চিন্তার বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব টের পাওয়ার পরই তারা এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত সক্রিয় হয়। এ ব্যাপারে সরাসরি দলীয়ভাবে কিছু করার অবস্থা না থাকায় কৌশল হিসেবে তারা তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতৃত্বাধীন বাম ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলিকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নামায়।

ছয়ই ফেব্রুয়ারি থেকে শাহবাগে হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রী, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকরাও বড় আকারে সমবেত হতে থাকে এবং দিবারাত্রি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। শুধু দুই-একদিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই গণজমায়েত চলতে থাকার সময় আওয়ামী লীগ সরকার হাজার-হাজার আন্দোলনকারীদের জন্য তিন বেলার খাওয়া ও পানির ব্যবস্থা করা ছাড়াও করপোরেশনকে দিয়ে তাদের জন্য অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করে! কোনো আন্দোলনের সময় কোনো সরকার এ ধরনের ব্যবস্থা আন্দোলনকারীদের জন্য করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আন্দোলনকে নিজেদের পক্ষে রাখা এবং একভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেটা যাতে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি পরিচালিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ করেছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের আরও উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকারীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার দাবির বাইরে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা নিয়ে যাতে কোনো আওয়াজ না তোলে সেটা দেখা। নিজেদের ঘরানার লোকজন দিয়ে আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সফল করেছিল। এ কারণে যুদ্ধাপরাধীদের 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই' শ্লোগানই হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাহবাগের আন্দোলনকারীদের মূল শ্লোগানে। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল জামায়েতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার শ্লোগান।

আওয়ামী লীগের এই সাফল্য সত্ত্বেও শাহবাগের আন্দোলনের কয়েকটি দিক খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, যা সাধারণত বাঙলদেশে এ ধরনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা সেখানে দেখা যায়নি। আন্দোলনকারীরা শাহবাগে তথাকথিত জাতির পিতা শেখ মুজিবের কোনো ছবি টাঙায়নি। তাঁর জায়গায় তারা টাঙিয়েছিল জাহানারা ইমামের ছবি, যিনি ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে প্রথম বড় আকারের এক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, শাহবাগে 'বঙ্গবন্ধু' নামে কথিত শেখ মুজিবকে গৌরবান্বিত করার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'জয় বঙ্গবন্ধু' আওয়াজ দেওয়া হয়নি। সেটা সম্ভব হয়নি, যদিও আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সে চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক হাজার-হাজার আন্দোলনকারীদের জন্য প্রত্যেক দিন তিন বেলা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা, এমনকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সামনে কোনো বক্তব্য

দেওয়া সম্ভব হয়নি; যদিও শাহবাগে উপস্থিত তাদের লোকজন সে চেষ্টা করেছিল। শাহবাগ আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি এসব বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা ও হিসাব করা ছাড়া সম্ভব নয়।

'৭১-এর যুদ্ধপরাধীদের বিচার দাবির জন্য বিশেষ রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের সময় যেভাবে লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, ব্যাপকভাবে নারী ধর্ষণ হয়েছিল, ঘরবাড়ি থেকে লোকদেরকে উচ্ছেদ সহ নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তার বিচার এদেশের কোটি-কোটি মানুষের আন্তরিক দাবি। বিয়াল্লিশ বছর ধরে এ বিচার না হওয়ায় যারা সরাসরি নির্যাতিত হয়েছিলেন তাঁরা ও তাঁদের বংশধর ও বন্ধুপরিজনদের অন্তরে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল এবং সে ক্ষোভ এখনো আছে। সেই ক্ষোভেরই অভিব্যক্তি দেখা গেল শাহবাগ আন্দোলনে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে কোনো সরকার ও তাদের রাজনৈতিক দলের কোনো আগ্রহ ও ভূমিকা না থাকার কারণেই এই আন্দোলনে কোনো রাজনৈতিক দলকে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার বিরোধিতা আন্দোলনের সূত্রপাতকারীরা ও যারা ব্যাপকভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। এক্ষেত্রে সব থেকে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র একমাত্র এবং অবিসংবাদী প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের কৃতিত্ব জাহিরকারী আওয়ামী লীগকেও তারা বাইরে রেখেছিল। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার কাজ শুরু করলেও তাদের প্রতি জনগণের যে কোনো আস্থা নেই সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। বিশেষত কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দণ্ড এই অনাস্থা বৃদ্ধি করেছিল। শেখ মুজিবের ছবি শাহবাগ চত্বরে না টাঙানো ও তাঁর জয়ধ্বনি করে সেখানে কোনো আওয়াজ না তোলা ছিল এদিক দিয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

'বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমা করতে জানে', এ কথা বলে শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানি সামরিক যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় সব থেকে বড় বেসামরিক যুদ্ধাপরাধী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করে এনে ১৯৭১ সালের শহিদ ও নির্যাতিতদের প্রতি পাকিস্তানিদের শত্রুতার ইতিহাসকে যেভাবে মুছে দিতে চেয়েছিলেন সেটা মানুষ যে ভোলেননি তার প্রকাশও শাহবাগ আন্দোলনের মধ্যে দেখা গেল। এদিক দিয়ে এ আন্দোলন শেখ মুজিবের মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁর দেশবিরোধী ও গণবিরোধী চরিত্র স্পষ্টভাবেই উন্মোচন করেছে।

শাহবাগ আন্দোলনের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনার আগে, কীভাবে ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে কৌশলের সঙ্গে তাদেরকে ভারতের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছিল সেটা দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই আন্দোলনের সময় অনেকেই বলেছেন যে, স্বাধীনতার ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের এই বিচার হচ্ছে! কিন্তু কী কারণে এ বিচার ১৯৭২-৭৩ সালে না হয়ে এখন হচ্ছে, এ নিয়ে কারও কোনো কথা আন্দোলন মঞ্চ আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের দ্বারা কৌশলগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে শোনা যায়নি। কাজেই এ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে এ দুটি দেশের সরকার পারস্পরিক নানা সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে। বলাই বাহুল্য যে, 'সিমলা চুক্তি' নামে পরিচিত এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর ও তার পরিপ্রেক্ষিতে। এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭৩, ভারত ও বাঙলাদেশ এক যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বলে, তারা উপমহাদেশে (অর্থাৎ, ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশে) উত্তেজনা প্রশমিত ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মানবিক কারণে পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ অন্য দেশের আটকে পড়া নাগরিকদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করবে, তবে যেসব পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে আটক রাখা হয়েছে তারা এর আওতার বাইরে থাকবে, কারণ বিচারের জন্য তাদেরকে বাঙলাদেশের প্রয়োজন হতে পারে।

এই ঘোষণার পর ভারত ও বাঙলাদেশ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অনেকগুলো বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের শেষে ২৭ আগস্ট ১৯৭৩ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, যার সাথে বাঙলাদেশ ঐকমত্য পোষণ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী সব মানবিক সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়। এরপর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই স্বীকৃতির পর পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙলাদেশের সরাসরি বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। এপ্রিল ৫ থেকে ৯, ১৯৭৪, এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাঙলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যথাক্রমে কামাল হোসেন, সরদার শরণ সিং ও আজিজ আহমেদ-এর মধ্যে। এই বৈঠকে যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ জন পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের বিষয়েও আলোচনা হয়। এসব তথ্যই পাওয়া যায় বাঙলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দলিলে। ৯ এপ্রিল ১৯৭৪ উপরোক্ত তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই

চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয় :

14. In this connection, the three Ministers noted that the matter should be viewed in the context of the determination of the three countries to continue resolutely to work for reconciliation. The Ministers further noted that following recognition, the Prime Minister of Pakistan had declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appealed to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971, that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people of Bangladesh knew how to forgive.

15. In the light of the foregoing and, in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war might be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement.

[Recorded verbatim as per circulation by the office of the foreign minister, government of Bangladesh]

ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে দেখা যায় যে, 'মানবিক' কারণে পাকিস্তান ও বাঙলাদেশে বেসামরিক লোকজন এবং ভারতে পাঠানো ৯০ হাজার ওপর পাকিস্তানি সৈন্যর সাথে ১৯৫ জন চিহ্নিত এবং বিচারের অপেক্ষায় থাকা পাকিস্তানি সামরিক অফিসারকেও মুক্তিদানের ব্যবস্থা হয়। এ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানান, ভুলত্রুটির বিষয় ভুলে গিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য! এই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে তিনি বাঙলাদেশে সফরের সিদ্ধান্তের কথা বলেন। বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, জনগণ যাতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভুলে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করে সেটাই তিনি চান! এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বাঙলাদেশের জনগণ জানে কীভাবে ক্ষমা করতে হয়! বাঙলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন সহ অন্য দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক এই চুক্তি স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হওয়ার পর ভারতে আটক ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী সামরিক অফিসারকে মুক্তিদান করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ভারত ও পাকিস্তানের স্বার্থে ভারতের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন করা হয়। বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমা প্রদর্শনের এই উদাহরণ স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের সব থেকে বড় ও ভয়ংকর বেসামরিক যুদ্ধাপরাধী ভূট্টোকে অতি সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে সরকারিভাবে বাঙলাদেশে নিয়ে আসা হয়। ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের মধ্যে 'মানবিক' কারণে সব অপরাধীকে খালাস দেওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকার সময় 'ক্ষমার আদর্শে' দালাল আইনে আটক অন্যসব বিচারাধীন দেশীয় ব্যক্তিকেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিদান করা হয়। যাদের চরম শাস্তির জন্য এখন শাহবাগ চত্বরে আন্দোলন হচ্ছে, তাদেরকেও ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিদান করেন। ‟বাঙলাদেশের জনগণ জানে কীভাবে ক্ষমা করতে হয়”— একথা বলে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সরকার সব সামরিক ও বেসামরিক যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দিলেও এবছরের ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে শাহবাগ চত্বরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তার শাস্তির জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং এখন যা বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এ আন্দোলনে যেভাবে লক্ষ-লক্ষ বৃদ্ধ, মধ্য-বয়স্ক, ও নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করছে তার থেকে এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ অপরাধীদেরকে শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী-বাকশালী সরকার ক্ষমা করলেও বাঙলাদেশের জনগণ তাদের ক্ষমা করেননি, এবং ৪২ বছর পরও ক্ষমার পরিবর্তে তাদের বিচার ও শাস্তির জন্য দেশজুড়ে এমন বিশাল আকারে আন্দোলন শুরু করেছেন, যার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত এ দেশে নেই।

‟বাঙলাদেশের জনগণ জানে কীভাবে ক্ষমা করতে হয়”--- এ কথা বলার কী অধিকার শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল? কিন্তু অধিকার না থাকলেও তিনি ক্ষমতামদমত্ত অবস্থায় স্বচ্ছন্দে সেই কথা বলতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি নিজে ও তাঁর পরিবারের কেউই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা সামরিক সরকারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তাঁদের কারো গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। যখন আক্রমণের ভয়ে সবাই পালিয়ে থাকল, তখন তিনি নিজে বাড়িতে বসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে

আত্মসমর্পণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও যুদ্ধে নেতৃত্বদানের কোনো ক্ষমতা তাঁর থাকেনি। তাঁর নেতৃত্ব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের অবস্থা ধসে পড়েছিল। এ কারণেই তিনি উপায়ান্তর না দেখে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাঁর দল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা সকলেই দেশের জনগণকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে প্রাণ রক্ষার জন্য ভারতে পালিয়েছিলে। সেখানে গিয়ে বাঙলদেশ স্বাধীন করার দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর অর্পণ করে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন! ভারত সরকারও তার সুযোগ ভালভাবেই নিয়েছিল, যদিও ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার জনগণ আন্তরিকভাবেই বাঙলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি আক্রমণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাঁরা ছিলেন বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। আওয়ামী লীগ ও তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিলেও এখন তারাই নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ধারক-বাহক, স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি ইত্যাদি বলে প্রচার চালিয়ে অন্যদেরকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বলে অহরহ গালাগালি ও দোষারোপ করতে অসুবিধা বোধ করে না।

যাই হোক, পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে আটক রেখেছিল। কিন্তু তাঁকে কোনো কষ্ট দেয়নি। ১৯৭২ সালে ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, আটক অবস্থায় তারা তাঁকে এরিনমোর তামাক নিয়মিত দিত; যে উৎকৃষ্ট তামাক তিনি পাইপে ব্যবহার করতেন। তাঁর পরিবারকে ঢাকায় ধানমণ্ডির এক বাড়ীতে আটক রাখলেও সেনাবাহিনী তাদের যেভাবে নিরাপত্তা দিয়েছিল, সেভাবে এ দেশের কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার কোনো ব্যাপার তখন ছিল না। তাঁরা ছিলেন আক্রান্ত এবং আক্রমণের মুখে। এটা ছিল এমন এক সময় যখন বাঙলাদেশের জনগণের কারও কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাঁর পরিবারের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা থেকে নিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থাই সামরিক বাহিনী করেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনার সন্তান হওয়ার সময় তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করেছিল ঢাকার সামরিক হাসপাতালে। তাঁর ছেলের জন্মও সেখানে হয়েছিল। কোনো অসুবিধা হয়নি। কাজেই শেখ মুজিবের পক্ষে ১৯৭১ সালের সামরিক ও বেসামরিক ক্রিমিনালদের ক্ষমা করা সম্ভব হলেও, যারা ধর্ষিত হয়েছিল, তারা ও তাদের আত্মীয়স্বজন তাদেরকে ক্ষমা করেননি। যাদেরকে সামরিক বাহিনী এবং তাদের বেসামরিক ঠেঙাড়ে বাহিনী হত্যা করেছিল, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে যাঁদের ওপরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তাঁরা মোটেই তাদেরকে ক্ষমা করেননি। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও যে তাদের ক্ষমা করেনি, তার প্রমাণ শাহবাগ চত্বরে ও দেশজুড়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের শাস্তির দাবিতে শুরু হওয়া ও চলতে থাকা আন্দোলন।

৫ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা বলার প্রয়োজন হলো এ কারণে যে, এ বিষয়ে কিছু না জানলে বর্তমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে কোনো ধারণা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যথাযথ ধারণার প্রয়োজন এ কারণে যে, এটা লাভ করলে তবেই বোঝা যাবে ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশ নামে যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তার শাসন ক্ষমতার চরিত্র কী ছিল, দেশের জনগণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়দায়িত্ব বোধ কীরকম ছিল। যারা এদেশে লাখ লাখ নিরীহ মানষকে হত্যা করেছিল, হাজার হাজার নারী ধর্ষণ করেছিল, লাখ লাখ মানুষকে ভারতে ও দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুহারার জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল; তাদেরকে যারা 'মহানুভবতা' দেখিয়ে ক্ষমা করেছিল তারা যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশের জনগণের অন্তরে মূর্ত আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণ না করেই লুণ্ঠনজীবী শ্রেণী হিসেবে দেশজুড়ে লুটপাট, চুরি-দুর্নীতি এবং হাজার হাজার বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হত্যা সহ জনগণের ওপর সব ধরনের শোষণ-নির্যাতন চালাবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। এ কাজই তারা করেছিল। কাজেই শাহবাগ চত্বরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা আপাতদৃষ্টিতে এবং ঘোষণা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে হলেও ৪২ বছর ধরে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি নানা ধরনের দলগুলির শোষণ-নির্যাতন, প্রতারণা ইত্যাদির বিরোধিতা যে তার মধ্যে ছিল, এটা এক বাস্তব সত্য।

এ কারণে জনগণ কোনো রাজনৈতিক দলকেই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, এমনকি শরিক করতেও চায়নি। সিপিবি-র নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ঘরানার বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকেও তারা সরাসরি কোনো ভূমিকা পালন করতে দেয়নি। আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মী, তাদের ঘরানার বামপন্থী দলসমূহ এবং ছাত্রলীগ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনের ওপর কিছুটা খবরদারি করতে সক্ষম হলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অল্পবয়স্ক লোকজন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনগণ এই রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলকে পাত্তা দেয়নি। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতানেত্রী প্রথম দিকেই শাহবাগে এসে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের দিকে

পানির বোতল নিক্ষেপ করা হয়। আরো কিছুদিন পরে কয়েকজন এসে কোনো রকমে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেও তাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা আন্দোলনকে নানাভাবে আয়ত্তের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছিল। 'জয় বঙ্গবন্ধু' আওয়াজ দেওয়াতে সক্ষম না হলেও ১৯৭১ সালে জনপ্রিয় হওয়া আওয়ামী লীগের দলীয় আওয়াজ 'জয় বাংলা' শাহবাগ চত্বরে মেনে নেয়া হয়েছিল। এটা ছিল এক ধরনের উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী লাইনে আন্দোলনকে পরিচালিত করার এক চেষ্টা। লক্ষ্য করার বিষয় যে, কয়েকদিন এই আওয়াজ শাহবাগে দেওয়ার পর এখন সেই আওয়াজের দেখা আর নেই। এর থেকেই বোঝা যায়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন 'জয় বাংলা' আওয়াজের মধ্যে ছিল সে দৃষ্টিভঙ্গি একটি ক্ষুদ্র অংশের চেষ্টা হলেও জনগণের জীবনে তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আর নেই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্য কোনো বিকল্প আওয়াজ না থাকায় এই আওয়াজ ব্যবহৃত হয়েছিল এক ধরনের স্বাধীনতার রণধ্বনি হিসেবে, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই আওয়াজের সেই আবেদন আর নেই। এর থেকে বোঝা যায় শাসক শ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন এই আওয়াজকে এখন রাজনৈতিকভাবে অব্যবহারযোগ্য করেছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদের উল্টো দিকে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর অন্য অংশের রাজনীতি হলো ধর্মভিত্তিক। এই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ঘরানার বিভিন্ন সংগঠন। এ ধরনের সংগঠন কিছুদিন থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। এগুলিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যরা সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলে প্রচার করলেও এরা সাম্প্রদায়িক নয়। ধর্মীয় রাজনীতি হলেই যে তা সাম্প্রদায়িক হবে এমন কোনো কথা নেই। হিন্দুদের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর কোনো আওয়াজ নেই, কোনো কর্মসূচি নেই। বাঙলাদেশের কোনো কোনো জায়গায় এখন হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এগুলো ঘটছে রাতের অন্ধকারে! কারা আসলে এ কাজ করছে এর হদিশ নাকি পুলিশও বের করতে পারছে না! হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষে জামায়াতে ইসলামের আক্রমণের কিছু সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার নয়, কিন্তু এ কাজ করে জামায়াতের কোনো রাজনৈতিক সুবিধা নেই। উপরন্তু সে সুবিধা আছে আওয়ামী লীগের। তারা পাকিস্তানি আমলের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' ১৯৭২ সালে বাতিল না করে তার নাম পরিবর্তন করে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' রেখে অবাধে হিন্দু সম্পত্তি দখল ও লুটপাট করে এসেছে। তারা নামে অসাম্প্রদায়িক হলেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ অন্য কোনো দলের লোকই করেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই এ কাজে অভ্যস্ত। কাজেই এখন হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে এর সাথে আওয়ামী লীগের লোকজন সম্পর্কহীন এটা মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের কথা বলে রাজনৈতিক ফায়দা আওয়ামী লীগের থেকে বেশি আর কার আছে? সরকার যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের ব্যাপারে কোনো তদন্ত করা এবং পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকছে, তাতে হিন্দুদের ওপর এই মুহূর্তের নির্যাতনের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এখন সাধারণভাবে জনগণের মধ্যেও আলোচনা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী হলো ধর্মভিত্তিক একটি মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল যার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি। সমাজের সব থেকে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশেরই এরা প্রতিনিধি। এদের প্রকৃত রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এখন জনগণের মধ্যে না থাকলেও শাহবাগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এরা বেশ বড় আকারে ও শক্তিশালীভাবে এখন রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে। এদের এই সক্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী নীতি ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে এদেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি সব ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। এখন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিচার হচ্ছে তারা প্রায় সকলেই ছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় লোক। এ কারণে দলটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধী। এই বিরোধিতা তারা নানা তৎপরতার মাধ্যমে করে আসছে। কিন্তু এখন তাদের তৎপরতা এক ব্যাপক ও বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। এদের এভাবে এগিয়ে আসার জন্য কিছুসংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্লগারও প্রাথমিকভাবে দায়ী। এদের সাথে দেশি-বিদেশি এক বা একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্কও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। শাহবাগ আন্দোলনের সময় এবং তার আগে থেকেও এরা নিজেদের ব্লগে ইসলাম এবং হজরত মহম্মদ সম্পর্কে নানা ধরনের অশ্লীল প্রচার চালিয়ে নিজেদেরকে নাস্তিক হিসেবে জাহির করে আসছে। এদের এই প্রচারকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে জামায়াতে ইসলামী ও তার সহযোগী সংগঠন এবং তার সাথে সম্পর্কিত একাধিক পত্রিকা পর্যন্ত শাহবাগ আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী ও নাস্তিকদের

আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে এক জেহাদ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলনকে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মের যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে হরতালের পর হরতাল দিচ্ছে। তাদের এইসব হরতালে যে সহিংসতা হচ্ছে এর তুলনীয় কোনো ব্যাপার এ দেশের ইতিহাসে কোনো দিন দেখা যায়নি। এদের হরতালের অর্থই দাঁড়িয়েছে রাস্তায় গাড়িতে আগুন দেওয়া, যাত্রীসহ বাস আক্রমণ করা এবং আগুন দেওয়া, স্কুটার-রিক্সা আক্রমণ করা, সাধারণ নিরীহ চলাচলকারীদেরকে পর্যন্ত আক্রমণ করা। আসলে এদের হরতালের পক্ষে কোনো জনসমর্থন না থাকাতেই একাজ এভাবে এদেরকে করতে হচ্ছে। বিএনপি প্রথম দিকে শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা না করলেও এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেও এখন জামায়াতের সাথে হাত মিলিয়ে তারা এই আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী নাস্তিকদের আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগেরও অবদান আছে। তারা নিজেরা জামায়াতের সাথে নানা গোপন আঁতাত বহুবার করলেও শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা জামায়াত ও বিএনপি একইভাবে করছে একথা ক্রমাগত প্রচার করে বিএনপিকে শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করেছে। শাহবাগ আন্দোলনকে ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে এই দ্বন্দ্বকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে দুই পক্ষই কাজ করছে এবং শাসকশ্রেণীর এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই সামগ্রিকভাবে তাদের শ্রেণী সংকটও ঘনীভূত হচ্ছে।

শাহবাগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে এবং তার কয়েকদিন পরও বিএনপির মূল আওয়াজ ছিল নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এখন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বাদ দিয়ে অর্থাৎ নির্বাচনের কথা বাদ দিয়ে হরতালের মাধমে 'দেশ অচল' করে আওয়ামী লীগ সরকারকে ফেলে দেওয়ার এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ শাহবাগ আন্দোলনকে যেভাবে নিজেদের নির্বাচনের স্বার্থে ব্যবহার করার চক্রান্ত করেছিল সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। হেফাজতে ইসলাম নামে চট্টগ্রামের একটি ভুঁইফোড় ইসলামী সংগঠন শাহবাগ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্লগারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ইসলামবিরোধী ও নাস্তিক হিসেবে তাদের শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দাবি করছে। জামায়াতে ইসলামের সহযোগী এই সংগঠনটি সহ অন্য কয়েকটি ইসলামী সংগঠন এভাবে যে দাবি তুলেছে, তাদের সঙ্গেও আওয়ামী লীগ সরকার গোপন সমঝোতা করেছে, যেমন সমঝোতা জামায়তের সঙ্গে তারা আগেও করেছে। এর ফলে 'ইসলাম ধর্ম অবমাননা', 'নাস্তিক-ব্লগার' ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন করে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিয়েছে! একটি ধর্মবিযুক্ত (secular) রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচয়দানকারী ও সাধারণভাবে পরিচিত এই দলটি যে কত বড় প্রতারক এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারী এর মধ্যে দিয়েই সেটা নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

শাহবাগ আন্দোলনের বিষয় আলোচনা শুরু করে সম্পর্কিতভাবে এখানে অনেক কথাই বলতে হয়েছে। শাহবাগ আন্দোলন সম্পর্কে যে বিষয়টি মূলত উপলব্ধি করা দরকার তা হলো, এটা বাহ্যত ও ঘটনাক্রমে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে শুরু হলেও সমাজের গভীর দেশে যে পরিবর্তন গত ৪২ বছরে ঘটেছে, বাঙলাদেশের লুণ্ঠনজীবী নব্য শাসকশ্রেণী লুটপাট, চুরি-দুর্নীতি, প্রতারণা, অবাধ হত্যাকাণ্ড, চরম রাজনৈতিক নিপীড়ন চালিয়ে জনগণের মধ্যে প্রতিরোধের যে তাগিদ সৃষ্টি করেছে তারই প্রতিফলন এবং অভিব্যক্তি এই আন্দোলনের মধ্যে ঘটেছে। এ ধরনের কোনো আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নয়। শাহবাগ আন্দোলনও এখন শেষ পর্যায়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে এবং নতুন প্রজন্মের চেতনায় এর প্রভাব এই সঙ্গে নিঃশেষিত হবে এমন মনে করা হবে এক মারাত্মক ভ্রান্তি। এই আন্দোলন ৪২ বছর পর বাঙলাদেশে এক নতুন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা ও দ্রুত বিকাশের শর্তই তৈরি করেছে। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেভাবে এখন হঠাৎ করে বাঙলাদেশের রাস্তা দখল করেছে একে স্থায়ী ব্যাপার মনে করার কারণ নেই। এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলরা, শুধু ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলরাই নয়, তাবৎ ক্ষমতাশালী প্রতিক্রিয়াশীলরা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতেই শক্তি সঞ্চয় করেছে। এদের শক্তির কোনো প্রকৃত ভিত্তি বাঙলাদেশের সমাজভূমিতে আর নেই। কাজেই এই দুই প্রধান ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে এদের প্রান্তিকীকরণ ঘটিয়ে, এদেরকে খতম করার জন্য বাঙলাদেশে এখন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ইতিবাচকভাবে সংগঠিতভাবে সক্রিয় হতে হবে। শাহবাগ আন্দোলন এই ধরনের রাজনৈতিক অগ্রগতির শর্তই তৈরি করেছে।

৪. ৪. ২০১৩

সাক্ষাৎকার : লাকি আকতার

শাহবাগ আন্দোলনে যে স্বতঃস্ফূর্ত যুব নেতৃত্ব উঠে আসে, তার প্রধান চেহারা হলো লাকি আকতার। শীর্ণ এই বঙ্গ কন্যার দীপ্ত শ্লোগান উদ্বেল করেছে শাহবাগ চত্বর, ঢাকা শহর, সমগ্র বাঙলাদেশ, তথা ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বের নানা প্রান্ত। এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩— শাহবাগ চত্বরে প্রায় তিন সপ্তাহ নিরবচ্ছিন্ন জমায়েতের পর সাময়িক যতির প্রথম দিনে।

লাকি বাম মনোভাবাপন্ন সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যখন পৌঁছলাম শাহবাগে, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্র-ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় পচে যাওয়া বাম ছাত্র 'আন্দোলন' দেখতে অভ্যস্ত আমি শাহবাগে লাকি-পিনাক— এদের কাছ থেকে দেখলাম। দেখলাম সৎ এবং সংগ্রামী ছাত্র-যুব আন্দোলনের ধারা, যা বাংলাদেশে জীবিত। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (পূর্বতন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্রী লাকি সেখানকার বেসরকারিকরণ ও জন-বিরোধী শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে উঠে আসে। শাহবাগে তাঁর শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিমা তাঁকে দিয়েছে 'শ্লোগানকন্যা' নাম। মুহুর্মুহু সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই টানা আন্দোলনে এক সময়ে শাসক দলের কিছু যুবক 'লাইমলাইট' কাড়তে তাঁকে গণ-জাগরণ মঞ্চের কেন্দ্র থেকে ধাক্কা দিয়ে সড়িয়ে দেয়। হাসপাতালে ভর্তি হয় লাকি এবং পরদিন ফিরে আসে। —গর্গ চট্টোপাধ্যায়

***গর্গ** : লাকি, আন্দোলন একটা নতুন পর্যায় নিয়ে যাবার জন্য, শাহবাগে নিরন্তর যে জমায়েত, সেটা তুলে দেওয়া হলো সে অর্থে, এই আন্দোলনের কী লাভ-ক্ষতির হিসাব যদি আমরা করি এই পর্যায়ে— তুমি কী ভাবে দেখো?*

লাকি : হ্যাঁ, এই আন্দোলনের লাভ যদি বলি, তাহলে অনেক অনেক প্রাপ্তি বলা যাবে। সেগুলোর মধ্যে যেমন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনাটা, সেই চেতনাটা আবার জনগণের মাঝে জাগতে শুরু করেছে। প্রত্যেকটা মানুষ এখন উত্তেজিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী ছিল, সেই চেতনাটা ভাবতে শুরু করেছে। এই প্রজন্মকে নিয়ে একটা কথা ছিল— আমরা কিছু ভাবিনা, শুধুমাত্র আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই জায়গা থেকে আমরা দেখেছি, হাজার হাজার মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রাপ্তিটা এই জায়গায়। রাজনীতিক একটা আন্দোলনের সাথে তারা সরাসরিভাবে যুক্ত হয়েছে। এটাই প্লাস পয়েন্ট। এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে আর একটা তথ্য হচ্ছে, মেয়েদের অংশগ্রহণ। নারীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সারা বিশ্বে, সারা বিশ্বে প্রত্যেকটি জায়গায় নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এবং নারীদের এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। এই আন্দোলনটায় এখন যে নতুন মোড় সৃষ্টি হলো, সেই মোড়ের আলোকেই এই দেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা।

***গর্গ** : তোমরা, যারা এই আন্দোলনে— তুমি এখনি একটা আভাস দিলে যে, মূলত কিশোর এবং যুবক শ্রেণী, তারাই এই আন্দোলনে একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে, অথচ এরা তো কখনোই, এদের কারোরই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বা সেই অর্থে, রাজাকার আন্দোলনের যে নৃশংসতা, তার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ঠিক আছে। তাহলে সেই চেতনাকে বহন করে, যা আসলে কয়েক দশকের পুরোনো অসমাপ্ত একখানা রাজনৈতিক ধারা, সেটাকে তুমি ধারণ করো কী করে? তোমার তো চোখে দেখা নয় ঘটনাটা।*

লাকি : প্রথমত, বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেই জায়গা থেকে প্রথম পেয়েছি ছোটবেলা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার জানার ইচ্ছের জায়গাটা। তারপর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে প্রবেশ করলাম, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করার পর থেকে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলাম এবং পড়াশোনার মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা আছে। সেই জায়গা থেকে ওটায় ছিলাম। যখন আমি আমাদের ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হই, তারপর থেকে আমরা দেখেছি, শুধু ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাসটাই দেখেছি, তখনও দেখেছি ইউনিয়নের অনেক নেতা খুন হয়েছেন, নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। '৭১-এ তো হয়েছেই। সেই জায়গা থেকেও একটা বিক্ষুব্ধতা কাজ করেছে। সেই জায়গা থেকে ঐ চেতনাটা ধারণ করাটা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। সেই কারণে আমি বদল আশা করছি।

***গর্গ** : ব্যাপক মানুষের ক্ষেত্রে, তুমি তো শুধু একা ছিলেনা...*

লাকি : ব্যাপক মানুষের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে, গত কিছুদিন যাবৎ, নভেম্বর মাস থেকে গত বছরের শেষ পর্যন্ত জামাত শিবিরের নৃশংসতা, সেটা সারা বাংলা দেশের মানুষকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এবং এই যে জামাত শিবির, তারা তো যুদ্ধ অপরাধীদের ধারা বহন করেছে। তারা কী ভাবে এই দেশের নৃশংসতা সৃষ্টি করে সেটা মানুষের মনে অনেক বেশি

বিক্ষুব্ধতা তৈরি করেছে।

গর্গ : একটা কথা বলো, এই আন্দোলনের ধারায় যে সমস্ত মুখ্য নাম উঠে এসেছে, তালিকা উঠে এসেছে, তার মধ্যে একটি নাম তোমার। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, তারকাকে ফোকাস করার গল্প থেকে তোমার রাজনীতিকে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। একটি ফিল্মস্টারের সঙ্গে তোমায় তফাত অনেক ক্ষেত্রে করা যাচ্ছেনা। সংবাদমাধ্যমের এই প্রবণতাকে তুমি কী ভাবে দেখো?

লাকি : সেটা এক একটি মিডিয়া বা সাংবাদিক, সেটা তাদের চিন্তা থেকে হচ্ছে। সে জায়গায় আপনারা দেখেছেন, প্রত্যেকটা জায়গায়, যতগুলো আমি টক-শো করেছিলাম, আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, আমি তো স্পষ্টভাবে আমার রাজনৈতিক পরিচয় ব্যাখ্যা করে বলেছি যে আমার কিন্তু মূল পরিচয়, আমি একজন বামপন্থী কর্মী। এই আন্দোলনের একজন সন্তান— সেটা আমার পরের পরিচয়, নতুন করে এবারের পরিচয়। আমার মূল পরিচয় কিন্তু আমি রাজনীতি থেকে উঠে আসা। সেটা আমি আমার জায়গা থেকে বলেছি। সেই জায়গা থেকে আমার প্রব্লেম হয়নি।

গর্গ : এই যে সাক্ষাৎকারটা আমি নিচ্ছি, মূলত ভারতের সংবাদমাধ্যমের জন্য, সেক্ষেত্রে একটা কথা, ভারতে সাম্প্রতিককালে কিছু ছাত্র-যুব-কিশোর আন্দোলনের জমায়েত হয়েছে, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বারবার বলা হয়েছে যে এটা অরাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনীতি নেই। সেখানে আমরা দেখেছি, এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করেছে এটা রাজনৈতিক আন্দোলন, কিন্তু অদলীয় আন্দোলন। কোন দলীয় আন্দোলন নয়...

লাকি : হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টে আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি, যদি কেউ বলে এটা অরাজনৈতিক আন্দোলন, তাহলে আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলি, মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। নির্দলীয়। সব জনসাধারণের অংশগ্রহণে একটা নির্দলীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। ঠিক একইভাবে, ২০১৩-এর যে আন্দোলন, এটাও একটা নির্দলীয় রাজনৈতিক আন্দোলন।

গর্গ : এখানে প্রথমদিকে, যে অনলাইন ব্লগার কমিউনিটি, এদের অ্যাক্টিভিটি লক্ষ্য করেছি। এবং পরে দেখেছি যে, পরে কিনা জানিনা, তার সঙ্গে বেশ কিছু বাম ছাত্র সংগঠন এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনও এর সমন্বয়তে যুক্ত হয়েছে। তা এই ধরনের ব্যাপক গণ-আন্দোলনে সবসময় লাভের গুড় খেয়ে যাওয়ার একখানা রেষারেষি হয়। সেই চিত্রটা তুমি কী ভাবে দেখো?

লাকি : সেই জায়গাটা আমরা খুব শক্ত ভাবে আইডেন্টিফাই করি এবং সুন্দরভাবে সেই আন্দোলন সম্পন্ন করি এইভাবে... এখনো শেষ হয়নি, যে সময়টার কথা বলতেছেন, সেটা বলতেছি— অনেকের হয়তো ফোকাস হওয়ার যে প্রবণতা, সেটাকে ছাপিয়ে আমরা নির্দলীয় যে চরিত্রটা— কারণ সবার কাছে আমরা এটা পরিষ্কার করেছি, এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে নির্দলীয় যে চরিত্র— সেই কারণেই গণ-মানুষ এত বেশি আসছে। সেই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠনের সাথে আমরা বসেছি। আমরা সবাই আলোচনা করি, আমরা পরিষ্কার করে বলি, যে এই এই জায়গাগুলোতে আমাদের নির্দলীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সে জায়গাগুলো তারা করেছে। যেখানে প্রব্লেম হয়েছে, আজকে এই জায়গাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে বললে, তারা কমিয়ে আনছে। এটা বলবো এই আন্দোলনের একটা শক্তি।

গর্গ : জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করার এক দাবি খুব জোরালোভাবে উঠেছে এবং জাতীয় সংসদ তা নিয়ে কিছু সহমত দেখাচ্ছে। একটা রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করা, মানুষের কাছে গিয়ে পরাস্ত করা থেকে নিষিদ্ধ করার শর্টকাট— এই রাজনৈতিক ঝোঁকটাকে তুমি কী ভাবে দেখো?

লাকি : আমি যেটা মনে করি যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথা জানিনা, জামাত শিবিরের রাজনৈতিক নিষিদ্ধকরণ চেয়েছি। কেন চেয়েছি? নাইনটিন সেভেনটিন-ওয়ানে, যখন পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, সেই সাথে তারা একটা স্টেটমেন্ট সাথে সাথে লিখে দেয় যে আমরা তো আত্মসমর্পণ করলাম, সাথে সাথে আমাদের যতো অক্সিলারি বাহিনী, মানে জামাত-আল বদর-আল সামস— এরাও সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করলো। তার মানে পাক বাহিনীকে যদি আবার এইখানে নিষিদ্ধ করা হয় বা তারা যদি আত্মসমর্পণ করে নিষিদ্ধ হতে পারে, সেই সময় কিন্তু যুদ্ধাপরাধী যারা তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, ঐ সময়ে। সেই জায়গা থেকে আমরা বলেছি, '৭১-এ তো তারা নিষিদ্ধ হয়েছে। '৭১-এর পর থেকে আজকে পর্যন্ত ৪২ বছরে তাদের যে শেকড় সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে— তাদের যে স্ফীতি, সেটা ভয়াবহ রকম। সেই জায়গাটা— এটা কিন্তু একটা প্রথম স্টেপ। আইন করে তারা নিষিদ্ধ করলো, জামাত শিবির এক ধরনের নিষিদ্ধ করলো কিংবা দশটা রাজাকার, তাদের মূল নেতাদেরকে, যারা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে ফাঁসি দিলো, তাতেই কী জামাত শিবিরের চিন্তা বা চেতনা, সেটা কী উচ্ছেদ হবে? আমরা বলছি— না। কিন্তু এটা একটা প্রাথমিক স্টেপ। এটা যদি আমরা করি, সেক্ষেত্রে আমাদের যে মূল ফাইট, তাদের ব্যবসা যদি বাজেয়াপ্ত হয় এবং আমাদের বিরাট রকমের কালচারাল রেভলিউশন যেটাকে বলি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তাহলেই জামাত শিবির পরাস্ত হবে।

আমাদের সেই কালচারাল ঐতিহ্য...সে আরো কয়েকগুণ বাড়াতে হবে। নাহলে এই জামাত শিবির, মৌলবাদীরা বা জঙ্গিগোষ্ঠী, তারা টিকে থাকে কীভাবে? তারা তো তাদের সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে টিকে থাকে। সেই জায়গা থেকে পাল্টা আর একটা অসাম্প্রদায়িক কালচারাল রেভলিউশন আমাদেরকে করতে হবে। সেটা তো অনেক বড়ো লক্ষ্য। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটাকে নিষিদ্ধ না করলে, আমাদের চলার যে পথ, সেটাতে আমার স্কোপটা গেল।

গর্গ : সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি, যখন '৭২-এর সংবিধান, যার মূল্য তুমি জানো, আবার করে প্রণয়ন করার সুযোগ ছিল, সেখানে আওয়ামী লীগ সরকার কিছুটা পিছু হটে একটি ধর্মের নানারকম ছাপ সংবিধানের নানা এলাকায় রেখে দিয়েছে। তোমার কী মনে হয়, এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা হয়তো আবার করে ভাবতে বা চাপে পড়তে বাধ্য হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে?

লাকি : হ্যাঁ এটাতো আমরাও ভাবি। আমরা পরিষ্কার বলেছি, '৭১-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সবার ছত্রছায়াতে কিন্তু এটা হয়েছে। শুধু একটা দলকে আইডেন্টিফাই করে বলিনি। আমরা বলেছি, পুরো ৪২ বছরের যে শাসন আমল, সেই শাসন আমলই কিন্তু দায়ী জামাত শিবিরের আজকের অবস্থার জন্য। সেই জায়গা থেকে আমরা বলেছি যে, এই যে জামাত শিবির, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে, '৭১-এর আন্দোলনের পরে '৭৫-এ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, '১১-তে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, '১২-তে... সুতরাং আমরা বলেছি, সবার প্রতি আমাদের আহ্বান, যে ধর্মটাকে রাজনীতি থেকে পৃথক করাটা অনেক বেশি জরুরি। কিন্তু তার আগে জামাত শিবিরের যে ইচ্ছাটা, সেটার এক নিষ্পত্তি করুক। প্রথম ধাপ, আগে '৭১-এর যে কলঙ্কটা, সেটা আমরা মোচন করি। মোচন করে, তারপরে লক্ষ্য ছিল '৭১-এর চেতনা যেটা। আমরা কিন্তু স্পষ্ট বলেছি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়ন করতে গেলে তো অনেক কিছু সংশোধন করতে হবে। সেটা আমাদের বড়ো লড়াই। এই কারণে আমরা গতকাল বলেছি, আমাদের মূল লড়াই শুরু হলো এখন। ১৭ দিন এখানে অবস্থান করেছি। এটা একটা সূচনা ছিল। কিন্তু এখন বিশাল বড়ো লড়াই। আস্তে আস্তে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করে তারপর আমাদেরকে বড়ো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

গর্গ : সেই অর্থে জমায়েত যখন কল-অফ করে নেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

লাকি : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমরা যেটা চিন্তা করেছি, আন্দোলন তো সবসময়— বিরামহীন ভাবে কখনো হরতাল চলতে পারেনা। বা বিরামহীন ভাবে একধরনের আন্দোলন চলতে পারেনা। আন্দোলনের প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে একে চেঞ্জ করা প্রয়োজন। সেই কারণে এটা আমরা একটা কৌশল হিসাবে নিয়েছি, এই সুযোগে প্রত্যেকটা জায়গায়, জামাত শিবির, তাদেরও শক্তিশালী গণভিত্তি যে আছে, আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়েছি আরও নির্দিষ্টভাবে, সেই জায়গা থেকে পাল্টা আমাদের যদি ঐরকম গণভিত্তি না থাকে, তাদের কাছে আমরা পরাস্ত হবো। কারণ প্রত্যেকটি জায়গায়, প্রত্যেকটি মোড়ে মোড়ে তাদের গণভিত্তি আছে। আমরা বলেছি, আমাদেরকে এখন সারা বাংলাদেশে ঐ ভাবে ছড়িয়ে যেতে হবে। এবং আপনারা দেখেছেন আমরা বিভিন্ন বিভাগে সমাবেশের ডাক দিয়েছি, বিভিন্ন অঞ্চলগুলাতে আমরা যাবো, ঢাকার মধ্যে অনেকগুলা জায়গাতে বড়ো বড়ো সমাবেশ হবে, যে জায়গাগুলোতে জামাত শিবিরের আধিপত্য আছে, সেই জায়গাগুলোতে যাবো। আমাদের যে সব জায়গাগুলোতে সাংগঠনিক ভিত্তি আছে, প্রত্যেকে যারা প্রগতিশীল বা আমাদের এই জনজাগরণ মঞ্চের সাথে যারা যুক্ত, তারা প্রত্যেকটা অঞ্চলে অঞ্চলে গিয়ে সেই অঞ্চলে ভিত্তি দাঁড় করাবো। এটা আমাদের একটা কৌশল।

গর্গ : শেষে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, তোমার যে শ্লোগান কন্যা নাম করা হয়েছে, এর পিছনে কিছুটা আছে, তোমার শ্লোগান দেওয়ার একটা স্বকীয় ভঙ্গি, এইটা তুমি ডেভালাপ করলে কী ভাবে?

লাকি : এটা তো— অনেকে শ্লোগান কন্যা বলছে, অনেকে অগ্নিকন্যা বলছে, কিন্তু আমি যেটা মনে করি, শ্লোগানের যে বিষয়টা— আমি ২০০৯ থেকে আন্দোলনে যুক্ত হই, সেই আন্দোলন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড়ো আন্দোলন—

গর্গ : কী কী আন্দোলন?

লাকি : হল উদ্ধারের আন্দোলন, সেটা বাংলাদেশের দৃষ্টি কেড়েছিল ঐ সময়।

গর্গ : হলটা কী নিয়ে?

লাকি : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল উদ্ধারের আন্দোলন। আমাদের যে বারোটি হল বেদখল, সেই হলের উদ্ধারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসেছিল—

গর্গ : কাদের দ্বারা বেদখল হয়েছিল?

লাকি : সেটা বিভিন্ন সরকারি সংগঠন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সংগঠনগুলো আছে, তারপর বিরোধী দলের অনেক নেতারা আছে, অনেকগুলো পুলিশের হাতে আছে, অনেকগুলো স্থানীয় অধিবাসী দখল করে আছে— বিভিন্নভাবে দখল ছিল, সেই আন্দোলন থেকে আমার শুরু। তারপর থেকে ছাত্র রাজনীতিতে আমি জড়িয়ে পড়ি। ঐ সময় আরো একটা বিরাট বড়ো আন্দোলন ঘটে। সেটা হচ্ছে ২৭(৪) ধারা বিরোধী

আন্দোলন, ২৭(৪) ধারা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন। সেই আন্দোলনে প্রাইম মিনিস্টার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়...

গর্গ : ২৭(৪) ধারাটা কী?

লাকি : ২৭(৪) ধারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কালো আইন, যে আইনের কবলে বাংলাদেশের যে শিক্ষাব্যবস্থা— শিক্ষাব্যবস্থাটাকে বাণিজ্যকরণের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা রোল মডেল হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এবং সেই কারণেই দিনের পর দিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়তে যে ব্যয়, সেই ব্যয় অনেক বেশি বাড়ছিল। এবং ২৭(৪) ধারা থাকার কারণে এটা একটা পাবলিকের আদলে একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছিল। সেই জায়গা থেকে আমরা বলেছিলাম, আমাদের একটাই দাবি ছিল যে আমরা পাবলিক মডেল চাই বা প্রাইভেট, সবাই বলেছিল পাবলিক পাবলিক। পাবলিক হলে তো তার হল থাকবে। এরকম কোন আইন থাকতে পারবে না, যে আইনে বলা থাকবে যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরাই সেই ব্যয় বহন করবে। গভর্মেন্ট কোন ব্যয় বহন করবে না। তারপর আমরা ঐ আন্দোলনটা গড়ে তুলি, এক বিশাল বড়ো আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্তমান সমসাময়িক কালে... বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে..., ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস যদি ঘাঁটতে হয় বর্তমান সমসাময়িককালে, তাহলে অবশ্যই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে যেতে হবে। সেখানে পরপর পাঁচ বছর ধরে টানা আন্দোলন চলতেছে, একটার পর একটা। ঐ আন্দোলন থেকেই উঠে আসা আমি। ঐ সময় থেকে আমার শ্লোগান দেওয়া শুরু। ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত, এখনো আমি ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। সেই থেকেই আমার শ্লোগান দেওয়া শুরু। আজ অবধি চলছে।

গর্গ : শেষে একটা প্রশ্ন তোমাকে— তুমি তো রাজনীতি করছো আজ কয়েক বছর হয়ে গেল। তোমার পরিবার থেকে অসুবিধা হয়না?

লাকি : না। আমার পরিবারের সাথে যদিও আমার রাজনৈতিক মতাদর্শের জায়গায় পার্থক্য আছে, সেই জায়গা থেকে, হয়তো রাজনৈতিক পরিবার হওয়ার কারণে রাজনীতিক ভাবে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু মতাদর্শের জায়গা থেকে সমস্যা আছে। কিন্তু আমার বাবা কখনোই চাপ দেননা। তিনি আমাকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছেন। তুমি যেটা মনে করবে, সেটাই করবে।

গর্গ : ধন্যবাদ লাকি।

নতুন মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র : ড্রোন

২২ পৃষ্ঠার পর

নতুন তৈরি হচ্ছে অরা (AURA)। এটির গতি অনেক দ্রুত। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি লক্ষ্যবস্তুকে ধাওয়া করে সেটিকে সনাক্ত করে ধ্বংস করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে ড্রোন ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীও তার অনুকরণে দেশের মধ্যে 'সন্ত্রাস' ও বিদ্রোহ মোকাবিলায় ড্রোন ব্যবহার করতে চাইছে। ২০১০ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছত্তিশগড়ের বস্তারের জঙ্গলে সংবাদ সংগ্রহের কাজে ড্রোন ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। মাওবাদী গেরিলারা কোথায় লুকিয়ে আছে, কোথায় যাচ্ছে, সেই সংবাদ সংগ্রহ ছিল উদ্দেশ্য। অবশ্য এই কাজে সামরিক বাহিনী তেমন সাফল্য পায় নি। অন্যদিকে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার নিয়ে বিরোধিতা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিন মাস পর এই কর্মসূচি পরিত্যক্ত হয়। ভবিষ্যতে কী করা হবে তা ভবিষ্যতই বলবে।

শুরু হয়েছে প্রতিবাদ

দেশে দেশে ড্রোন হানা নিয়ে ভয়ানক প্রতিবাদ চলছে বললে ভুল হবে। এই হানা চলছে সাধারণত দেশগুলির সীমান্ত এলাকায়, অথবা উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে, কিংবা ইরাক বা আফগানিস্তানের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধাঞ্চলে, অথবা পাকিস্তান বা উগান্ডার মতো শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। কিন্তু এ নিয়ে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। ড্রোন হানার শিকার যারা, তাদের প্রতিবাদ বিশ্বের মালিকদের কানে পৌঁছায় না। কিন্তু এখন খোদ আমেরিকাতেও ড্রোন বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। এমাসের ১৩ তারিখে খোদ হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখান ড্রোন বিরোধী অ্যাক্টিভিস্টরা। এপ্রিল মাসটাকে তারা ড্রোন বিরোধী বিক্ষোভের মাস বলে তুলে ধরছেন। প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে। বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, আটলান্টা, চিকাগো, সিয়াটেল, আরও কয়েক ডজন শহরে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিগো শহরে ড্রোন তৈরির কারখানা ও তার মালিকের বাসস্থানের সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। ড্রোন হানার ফলে যে নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে শিশুরাও— এটা বিক্ষোভের একটা বড় জায়গা।

তথ্যসূত্র

The Hindu

Dawn.cm

Military Robots and Drone, Paul J. Springes, 2013

Marc Ambinder, *The Week*

'A Secret Deal on Drones, Sealed in Blood', Mark Masetti, *The New York Times*

Hidden Histories, America's Secret Drone War in Africa, David Axe

'India's Indegenous Drones', Semu Bhatt, *Himal*

'The Thistle and the Drone : How America's War on Terror became War on Tribal Islam', Akbar Ahmed

'Obama Terror Drones : CIA tactics in Pakistan include targeting Rescuers and funerals'

প্রবন্ধ

মহঃ আফজল ও কাশ্মীর উপত্যকা

তাপস চক্রবর্তী

কার দ্বারে দাঁড়াইব বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক স্মরিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে —রবীন্দ্রনাথ

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দুটি। ভারত-রাষ্ট্রের হিংস্র ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল চুপিসারে, পরিবার পরিজনকে অন্ধকারে রেখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ বারো বছর (২০০১-২০১৩) কারাগারে থেকে আফজল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছে আইনি সন্ত্রাসের নানান মুখ। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়: আগে অপরাধী বানাও, তারপর তদন্ত প্রক্রিয়া চলুক, বিচার চলুক রাষ্ট্রের মর্জিমাফিক। ১৩ই ডিসেম্বর ২০০১ সংসদ হামলার ঘটনা ঘটে। চারজন সশস্ত্র অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতি ও আটজন নিরাপত্তারক্ষী মারা যান। দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল তদন্তে নেমে ১০ই ডিসেম্বর শ্রীনগর থেকে গ্রেপ্তার করে মহঃ আফজল গুরুকে, গ্রেপ্তার হন আফজল-এর সম্পর্কিত ভাই শওকত হোসেন, তার স্ত্রী আফসনা এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এ আর গিলানি। ন্যায়বিচারের সমস্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে ২০ ডিসেম্বর ২০০১ দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল এক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে। যেখানে আফজলকে হাতকড়া পড়া অবস্থায় হাজির করেন দিল্লী পুলিশের এসিপি রাজবীর সিং। উপস্থিত ছিল NDTV, Zee news, Sahara TV, আজতক ইত্যাদি। ছিল কাশ্মীরের STF (Special Task Force)-এর আধিকারিকেরা, যারা দীর্ঘ ৭ বছর ধরে (১৯৯৪-২০০১) আফজল ও তার পরিবারকে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক নির্যাতন করে এসেছে ধারাবাহিকভাবে। যারা চিহ্নিত হয়ে আছে 'উর্দিধারী খুনে বাহিনী' হিসাবে, বিশেষত কাশ্মীরের নাগরিকদের কাছে।

মিডিয়ার কাছে আফজলকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল এবং কাশ্মীরের STF (বিশেষত DSP দ্রাবিন্দর সিং এবং DSP বিনয় গুপ্ত-র নেতৃত্বে)-এর হেফাজতে অত্যাচার ও ভয় দেখিয়ে, এমনকি আফজলের সম্পর্কিত ভাই হিলাল আহমেদ গুরুকে ২ মাসের উপর STF নিজেদের হেফাজতে আটকে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করেছিল। আর আমরা ভারতীয় নাগরিকেরা টিভির পর্দাজোড়া বক্তব্যকে নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ঝড় তুলেছি। এইভাবেই রাষ্ট্র তার অনুকূলে সমর্থনের ভিত্তি গড়ে তোলে। নোয়াম চমস্কী যাকে বলছেন "Manufacturing Consent", এবং যার প্রতিফলন ঘটে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়েও। আফজলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারকরা যে যুক্তি হাজির করেছেন তা হলো:

> বিরাট সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে যে ঘটনাটি সেটি সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়েছে এবং সমাজের সমষ্টিগত বিবেক সন্তুষ্ট হবে যদি অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।
>
> ভারতের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সন্ত্রাসবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীদের এইসব কাজের দ্বারা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার একমাত্র ক্ষতিপূরণ হতে পারে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাসঘাতক কাজের একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে প্রমাণিত তার সর্বোচ্চ শাস্তি দানের মাধ্যমে। বিচারপ্রার্থী যে একজন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি এবং যে জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে আসছে, সমাজের কাছে ভীতিজনক এইরকম একজনের লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। তাই আমরা মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, জনগণের সমষ্টিগত বিবেক কি একজন নাগরিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে সন্তুষ্ট হতে পারে?

মনে রাখা দরকার, আফজলের "আইনি হত্যা" শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড বিরোধী আন্দোলনের বিষয় নয়, কাশ্মীরী জনগণের ক্ষেত্রে এর অভিঘাত আরও গভীরে। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাই নি ১৯৮৪ সালে কীভাবে কাশ্মীর উপত্যকার মকবুল ভাটকে দায়রা জজ ফাঁসি দিয়েছিল। যার বিরুদ্ধে কোন উচ্চ আদালতে আবেদন করা যায় নি। কারণ যে আইনে মকবুল ভাটের বিচার হয়েছিল সে আইনটি ব্রিটিশ আমলের তৈরি "Enemy Agent Ordinance 1943"। যে আইনে আপিলের কোন সুযোগ ছিল না। ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় উদ্বেল হয়েছিল কাশ্মীর। কাশ্মীর উপত্যকার মানবাধিকার সংগঠন "কাশ্মীর কমিশন অফ জুরিস্ট"-এর সভাপতি ও একজন পেশাদার আইনজীবী ছিলেন জলিল আন্দ্রাভী। ১৯৯৬ সালে আন্দ্রাভী জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন—হেফাজতে বন্দী কাশ্মীরীদের নাম, কোন অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের আটক রাখা হয়েছে, কী অমানবিক পরিবেশে তাদের দিন কাটছে— এই বিষয়গুলি ছিল আবেদনের ভিত্তি। এই মামলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইকে এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করেছিল। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, কাশ্মীরের কোন

রাজনৈতিক বন্দীকে জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরের কোন জেলে রাখা যাবে না। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবেও বন্দীরা স্বীকৃত হয়েছিলেন। তবে আন্দ্রাভীর এই সাহস ও মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতা রাষ্ট্র ভাল চোখে দেখেনি। স্বামীকে সাথে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে ১৯৯৬-এর মার্চ মাসে জলিল আন্দ্রাভীকে অপহরণ করা হয়েছিল। ১৯৯৬-এর ২৭শে মার্চ গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ঝিলামের জলে ভাসতে দেখা যায়।

ড. আবদুল আহাদ গুরু ছিলেন সৌরা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে কর্মরত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। ১৯৯০ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় 'গণ নিরাপত্তা আইনে''। তাঁর অপরাধ, তিনি কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। বিনা বিচারে চার মাস আটক থাকার পর তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাবার পরও তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী তাঁকে অপহরণ করে ১৯৯৩-এর ৩১শে মার্চ। একদিন পর রাস্তার ধারে তাঁর গুলিবিদ্ধ নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

উপত্যকার অধিকার রক্ষা আন্দোলনের সংগঠনগুলির যৌথ অনুসন্ধানে উঠে আসে ভয়ঙ্কর তথ্য। প্রায় ছয় হাজার অচিহ্নিত কবরের (unmarked grave) অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। যার সত্যতা স্বীকৃত হয় জম্মু-কাশ্মীর মানবাধিকার কমিশনের দেওয়া বিবৃতিতে। কমিশনে ২১৫৪টি unmarked grave-এর কথা স্বীকার করেন। উপত্যকার কুপওয়ারার একটি গ্রাম চিহ্নিত হয়ে আছে ''widow village'' নামে। আফজল গুরুর মৃত্যুকে অবশ্যই দেখতে হবে ভারত রাষ্ট্রের এই হিংস্রতার প্রেক্ষিতে।

সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক কে এই মহঃ আফজল গুরু—

জম্মু-কাশ্মীরের বারামূলা জেলার সপোর গ্রামে আফজালের বাড়ি। দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা এক মেধাবী ছাত্র। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ ঘটেছিল মেধার কারণেই। সময়টা ১৯৯১-৯২। জাতিসত্তার আন্দোলনে উত্তাল কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টে (JKLF) এই সময় যোগ দেন আফজল। লেখাপড়া ছেড়ে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে হাজার হাজার নবীন প্রজন্মের সাথে। কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে আসেন এবং ১৯৯৩ সালে BSF-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। চেষ্টা শুরু করেন অর্থ উপার্জনের। ঔষধ ও শল্যচিকিৎসকের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল পুলিশ, বিশেষত STF (Spacial task Force)। STF-এর এজেন্ট হিসাবে কাজ শুরু করার জন্য চাপ সৃষ্টি শুরু হয়। শুরু হল প্রতি মাসে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়। পরিবারে উপর চাপ, মাঝে মাঝে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ভয়ঙ্কর নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত STF ও দিল্লী পুলিশের সৌজন্যে পার্লামেন্ট হানার ঘটনায় তাকে চক্রান্তকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ভারতীয় নাগরিকদের অনুভূতিকে শান্ত করার জন্য এখন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। সুপ্রিমকোর্ট নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে তার রায়ে— ''মহঃ আফজল কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।'' POTA আইনের ৩(২) ৩(৫) ধারার অভিযোগগুলিও বাতিল হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১২১, ১২১(ক), ১২০(খ) ধারায় আফজলের বিচার হয়। দায়রা আদালত, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে একতরফা বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে ''ভারতীয় গণতন্ত্রের শত্রু''কে নির্মূল করা হল। ভারতীয় আইনের নৈতিকতার চোখে যারা বাবরি মজজিদ ধ্বংস করেছিল, যারা ১৯৮৪ সালে দিল্লীর রাজপথে হাজার শিখকে হত্যা করেছিল, যারা গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞে সামিল ছিল, যারা ১৯৮৩ সালের নৈনী গণহত্যা ঘটিয়েছিল, যারা কর্পোরেটদের উদর পূর্তির জন্য ভারতবর্ষের ভূমিপুত্রদের হত্যা করে— সেই 'মহান নায়কেরা' গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে চিহ্নিত হল।

এক ঘৃণ্য নোংরা রাজনৈতিক খেলার শিকার মহঃ আফজল। যখন ভারতীয় জনতা পার্টি স্লোগান তোলে—''দেশ আভি শরমিন্দা হ্যায়/আফজল আভি জিন্দা হ্যায়'', তখন একজন মানুষ হিসাবে মাথা হেঁট হয়ে যায়। আফজলের স্ত্রী তাবাসুম জানিয়েছিলেন, কীভাবে পোটা আদালতে আফজলের কোন কথাই বিচারপতি শুনতে চাননি, বক্তব্য নথিভুক্ত করা যায় নি।

নন্দিতা হাকসারের 'Hanging Afjal would be a stigma on Indian Democracy' বইটি, 'The Hanging of Afjal Guru' এবং নির্মলাংশু মুখার্জির তথ্যবহুল গ্রন্থ 'December 13: Terror over Democracy' লেখাগুলিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা-পরায়ণ রাষ্ট্র বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে হত্যা করেছে আফজলকে।

এমনকি আফজল, তার পরিবার ও বিভিন্ন দিক থেকে উঠে আসা পুনঃবিচারের আবেদনও খারিজ করে দেওয়া হয়।

অথচ ১৯৮০ সালে শিখ গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত জগদীশ টাইটেলার-এর পুনঃবিচারের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেছিল

বিচারপদ্ধতির দ্বিচারিতা এখানেই। পার্লামেন্ট হামলার ঘটনা ও আফজালের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ভীষণ জরুরি।

(১) সমগ্র আক্রমণের ঘটনাটি CCTV-তে রেকর্ড করা হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শ্রী কপিল সিব্বাল এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নাজমা হেপাতুল্লা CCTV-র রেকর্ডিং সংসদের সমস্ত সদস্যদের দেখানোর দাবি তোলেন। সংসদের মুখ্য সচেতক শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বলেন, ''আমি ছয়জনকে

গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি''। কিন্তু মারা গেছেন পাঁচজন। পুলিশের বক্তব্য ছিল, পাঁচজনই ছিল ঐ গাড়িতে। প্রশ্ন হল, কে সঠিক? যদি দাসমুন্সি সঠিক হন তবে ষষ্ঠ ব্যক্তিটি কে? এখন সে কোথায়? যে প্রশ্ন আরও ভাবায়— ঐ CCTV-তে যা দেখা গেছে তা বিচার প্রক্রিয়ায় প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হল না কেন? কেনই বা ঐ CCTV-র ফুটেজ সাধারণ মানুষকে দেখানো হলো না?

(২) আক্রমণের দিনই দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল জানায়, এই ঘটনা *জেশি মহম্মদ* এবং *লস্কার ই তৈবার* যৌথ পরিকল্পনার ফসল। তারা আরও বলেন, এই আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন 'মহম্মদ' নামে এক ব্যক্তি, যিনি ১৯৯৮ সালে IC-814 বিমান অপহরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। (যদিও CBI পরবর্তীকালে এই তথ্য ভুল বলে জানায়) এর কোনটি বিচারালয়ে প্রমাণিত হয় নি। প্রশ্ন হলো, দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেলের এই দাবির ভিত্তি কোন্ প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে?

(৩) এই সমস্ত প্রশ্ন ওঠার পরই কেন লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হল?

(৪) একথা কি সত্যি যে ১৩ ডিসেম্বর সংসদ হামলার অনেক আগে থেকেই পাকিস্থান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের কাজ শুরু হয়েছিল?

(৫) ফৌজদারি তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ হাজির করা হচ্ছে সেগুলি সংগ্রহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা। পুলিশ কীভাবে মহঃ আফজল পর্যন্ত পৌঁছে গেল? স্পেশাল সেল বলছে, গিলানী এক্ষেত্রে তাদের মূল মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু তথ্য বলছে, গিলানীকে গ্রেপ্তার করার আগেই শ্রীনগর পুলিশ আফজল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং আফজল তাদের হেফাজতে ছিল। সুতরাং এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে দিল্লী স্পেশাল সেল কীভাবে আফজলকে ১৩ই ডিসেম্বর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করল?

(৬) বিচারালয় জানেন যে মহঃ আফজল একজন আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসবাদী। তার সাথে নিরাপত্তাবাহিনী এবং জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ বাহিনীর Special Task Force (STF)-এর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাদের নজরদারিতে থাকা অবস্থায় এরকম জঙ্গি হামলার ষড়যন্ত্র কীভাবে সম্ভব হল? নিরাপত্তা বাহিনী এর ব্যাখ্যা কী দিলেন সে প্রশ্ন অনিবার্য্যভাবেই এসে পড়ে।

(৭) আদালতে দেওয়া তার বয়ানে আফজল জানায় যে 'মহম্মদের' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তাকে 'তারিক' নামে STF-এর এক জওয়ানের সঙ্গে দিল্লী পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার্জশিটে তারিকের নাম আছে। এখন তারিক কোথায়?

(৮) সংসদ হামলার ৬ দিন পর অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর ২০০১ থানের (মহারাষ্ট্র) পুলিশ কমিশনার এম এম সাঙ্গারী হামলাকারীদের মধ্যে নিহত মহম্মদ ইয়াসিন ফতে মহম্মদ ওরফে আবু হামজাকে সনাক্ত করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, লস্কর-ই-তৈবার এই সক্রিয় সদস্য ২০০০ সালে মুম্বাইতে গ্রেপ্তার হন এবং তাকে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, পুলিশ কমিশনার সাঙ্গারীর বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে পুলিশ হেফাজতে থাকা মহম্মদ ইয়াসিন কিভাবে সংসদ হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকলেন?

উত্তরগুলি পাওয়া ভীষণ জরুরি।

এই মামলায় ৮০জন PW (Previous witness) ছিলেন। তার মধ্যে ৭১ জনই BSF, CRPF, Security Guard, STF এবং দিল্লী পুলিশের স্পেশাল আধিকারিকেরা।

খুব সংগত কারণেই মহঃ আফজলের স্ত্রী তাবাসুম লেখেন:

> ''আমার স্বামীর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কি আপনারা মুখ খুলবেন না? আমি অবশ্যই আমার স্বামীর জীবন, আমার সন্তানের পিতার জীবন রক্ষার জন্য লড়াই করছি। কিন্তু আমি বলছি একজন কাশ্মীরী মহিলা হিসাবে, যে ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, আস্থা হারিয়ে ফেলেছে কাশ্মীরী মহিলাদের প্রতি ভারতীয় গণতন্ত্রের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার অক্ষমতার ওপর'' (সেপ্টেম্বর ২০১৩)।

২০০৭ সালে নন্দিতা হাকসার, এন ডি পানবেলি সহ একাধিকজন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড রোধের জন্য: ''We realise the fight to abolish death penalty is not easy. However the fact that you have taken a public stand on the issue has kindled a new hope, not only in the hearts of human rights community but those waiting in death row, their families and friends.'' মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের জাতীয় বিতর্কের আবেদন আজও অধরা।

ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার 'মহাকাব্যে' মহঃ আফজলদের জন্য কোন রক্ষাকবচ থাকবে না। একে মুসলমান, কাশ্মীরের নাগরিক এবং প্রথম যৌবনে ''আজাদ কাশ্মীরের'' স্বপ্ন দেখত।

কাশ্মীরের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, সেইজন্য কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির পর থেকেই অধিকাংশ উপত্যকার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাবি হিসাবে চিহ্নিত করা চলছে। T N Madan তাঁর বিখ্যাত বই 'Withen Indian Secularism'-এ লিখেছেন ''...আসলে কাশ্মীরী সত্তা এবং কাশ্মীরী মুসলিম সত্তায় কোন তফাত নেই''। ১৯৯৩ সালে বলরাজ পুরী লিখছেন তাঁর

'Kashmir towards Insurgrey' পুস্তকে। ''কাশ্মীর একটি অঞ্চলের দখল নিয়ে গণ্ডগোলের থেকে অনেক বেশি কিছু, এটি একটি জাতীয় মর্যাদার বিষয়, যা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে আঘাত করেছে। গোটা জাতি যদি কাশ্মীরের মানুষের দুর্দশার প্রতি একটি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে, তবে একটি সভ্য দেশ হিসাবে ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।'' আম-ভারতীয়দের কাছে কাশ্মীর মানে ডাললেক, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, সোনমার্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। কাশ্মীরী সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যকে ইতিহাসের আলোকে দেখবার বা বুঝবার চেষ্টা হয়ত করিনি, করলে বুঝতাম তাঁদের যন্ত্রণাকে, উপলব্ধি করতে পারতাম ভারত রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণার কারণগুলিকে। '৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নেহরু থেকে মনমোহন, উপত্যকার মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার, কথা না রাখার যে ধারাবাহিকতা অনুশীলন করেছেন তার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমাজ। যতই আমরা বিচ্ছিন্নবাদ, সন্ত্রাসবাদ, পাকিস্থানি জঙ্গি কার্যকলাপের কথা বলি না কেন, ইতিহাস কিন্তু তা মেনে নেবে না। ভুলবে না ন্যাশনাল কনফারেন্সের, কাশ্মীরী উপত্যকার অবিসংবাদী নেতা শেখ আবদুল্লাকে জহরলাল নেহরু কর্তৃক কার্যত বিনা বিচারে সুদীর্ঘ সময় কারারুদ্ধ করে রাখা। অপরাধ, ন্যাশনাল কনফারেন্স আওয়াজ তুলেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে। পাকিস্তান-ভারত কোন রাষ্ট্রেরই অধীনস্থ থাকতে চায়নি। ভারত সরকার সমগ্র বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে। তাই আজ কাশ্মীর ভ্যালিতে মজুত রাখতে হয়েছে প্রায় ৮ লক্ষের মত আইনরক্ষকদের (BSF, CRPF, R.R., STF, Sp. Police এবং পুলিশ বাহিনী)। জারি রয়েছে ভয়ংকর দানবীয় কালাকানুন, UAPA, AFSPA। বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণভাবে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়, আত্মমর্যাদার বিষয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়। আফজলের মৃত্যু অনিবার্যভাবে উপত্যকায় মানুষের যন্ত্রণা, ক্ষত এবং ক্ষোভকে উসকে দিয়েছে। তার মৃত্যু কাশ্মীরী জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ড ক্ষোভের। কাশ্মীরের জনগণ রাস্তায় নেমে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রকাশ করেছেন শুধু আফজলের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধেই নয় ভারত রাষ্ট্রের কাশ্মীরী নীতির বিরুদ্ধেও। আফজল হয়ে উঠেছে এই নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের প্রতীক। ঘটছে প্রত্যাঘাতের ঘটনা। বিচারব্যবস্থা যাই বলুক, ভারতীয় জনতা, নাগরিক সমাজ, হিন্দু মৌলবাদীদের সমস্ত ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আফজালকে উপত্যকার মানুষ শহিদের সম্মান জানিয়েছে। কার্যত কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারত রাষ্ট্র সেনা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কার্ফু জারি করেছে। রাস্তা জুড়ে রাষ্ট্রীয় বুটের শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে। ফুঁসছে উপত্যকার প্রতিবাদী মানুষেরা, উপত্যকার আমজনতা, ঝিলামের জল, চেনারের জঙ্গল এবং 'অগ্নিকোণ'।

শিক্ষা নিন ভারতীয় শাসকেরা। কান পাতুন, উপত্যকার বাতাস কী বলে? ''হৃদয়ের ক্ষেত পুড়ে পুড়ে সাফ হয়'', মিছেই উপত্যকায় শান্তি অন্বেষণ।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

- APDR বালী শাখা ও আলিপুরদুয়ার শাখার প্রকাশনা
- কাশ্মীর— সিদ্ধার্থ গুহ
- The Hanging of Afjal Guru with an introduction by Arundhuti Roy
- মৃত্যুদণ্ড— সুজাত ভদ্র
- Kashmir towards Insurgncy— Balraj Puri

সাম্প্রতিক

বিশ্বজিৎ রায়

ছোট ছোট ঘটনা-দুর্ঘটনার বাঁকে সাজানো
শাসকের রঙিন প্রতিকৃতি ছিঁড়ে ফর্দাফাই।
ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা লেগে বা বদহাওয়ার দমকে
চালচিত্র ভেঙে বেরিয়ে পড়ছে খড়-মাটি-কাঠ,
স্নেহের স্মিতহাসি মুখে ফুটে উঠছে কঙ্কাল-কপাটি।
কে যেন বলেছিল ক্ষমতার লিঙ্গভেদ নেই...
ভূমিকা বদল হলে নারীও নিরো হতে পারে,
অমান্যের দর্শন হিংস্র প্রহারে শেখায় মান্যতার আইন।
কোথাও কোনও পবিত্র ক্রোধ পড়ে নেই
এক বিন্দু অশ্রুজলও তুলে রাখা দায়
যুযুধান শিবিরের সীমানা পেরিয়ে
যা ঝরে পড়বে নিহত যুবকের শেষ যাত্রায়।
লাশের স্তূপের উপর জমে উঠেছে
পরিবর্তন আর প্রত্যাবর্তনের পাশাখেলা
এসময় পতাকার ছায়া সরিয়ে সন্তানের মুখ
খোঁজে যদি কেউ, কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে
মায়ার বাঁধন যার ছিঁড়েও ছেঁড়ে না
আদিগন্ত শ্মশানে-কবরে ঢাকা পোড়া বাংলায়

যাঁর বেহালার ছড়ে জেগে ওঠে ভুলে-যাওয়া ক্ষত
আমার ছিন্নমুখ নিয়ে তাঁর পাশে কীভাবে দাঁড়াই বলো?

অন্য চোখে

কাসভ...সর্বজিৎ... আস্মি

মালবিকা মিত্র

আজ ছাড়া পাবে তাদের দাদা, সর্বজিৎ সিংহ। ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়েছে ভাইজি স্বপ্নদীপ... পিসি দলবীর। গতকাল রাতটা ওরা দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। বড় দীর্ঘায়ত রাত্রি। উত্তেজনায় পিসি ভাইঝি ছটফট করছে। খবরটা শুনে প্রথমে ওদের বিশ্বাস হয় নি। দুদশক পর, বাইশ বছর পর, মুক্তি পাবে সর্বজিৎ। পাকিস্তানে লাহোর ও মুলতানে সেই ১৯৯০ সালে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ... প্রত্যক্ষভাবে দোষী সাব্যস্ত সর্বজিৎ সিংহ। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়েছে। এখন সে পাক কারাগারে বন্দী। আশা আশঙ্কায় প্রহর গুনেছে পিসি ভাইঝি। গতকাল ২৭শে জুন, মঙ্গলবার এক ঝলক বসন্ত বাতাসটুকুর মতো খবরটা এলো পাক সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে, সর্বজিৎ সিংহ মুক্তি পাচ্ছে আগামী কাল।

বহু প্রতীক্ষার মুক্তি, কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। নির্দোষ সর্বজিতের মুক্তি। ঘরে ফেরা। স্বপ্নদীপের ভালোমতো মনে নেই বাবার চেহারাটা। পিসি দলবীর জানে সর্বজিতের পছন্দ, অপছন্দ, ভালোলাগা। কিন্তু সেও তো বাইশ বছর আগের। তবুও পরিবার-প্রতিবেশীর আয়োজন প্রস্তুতির খামতি ছিলো না। শুধু কি পরিবার-প্রতিবেশী! সরকারি কর্তারাও আবেগে উত্তেজনায় টানটান। ভারতীয় বিদেশ সচিব রঞ্জন মাথাই পাক বিদেশ সচিব জলিল আব্বাস জিলানীকে বলেছেন— সর্বজিৎকে নিয়ে জাতীয় আবেগ তৈরি হয়েছে। মানবিক কারণেও তার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। জিলানী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, পাক নেতৃত্বকে তিনি সব জানাবেন। অর্থাৎ সরকারি কর্তাদেরও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না। সেই উৎকণ্ঠার অবসান হল বুঝি।

ইস উল্লাস কো কড়ি সে কড়ি সাজা মিলনা চাহিয়ে... ২৬/১১র মুম্বাই হামলার প্রধান পাণ্ডা কাসভের ফাঁসি চাই, ফাঁসিই ওর উপযুক্ত সাজা, একমাত্র সাজা। মুম্বাই হামলার আরো কিছু তথ্য পেশ করেছেন ভারতের বিদেশ সচিব। তথ্য থেকে স্পষ্ট হামলার সাথে পাক সরকারের সম্পর্ক, পাক মদত প্রমাণিত। ইসলামাবাদের ঠ্যাটামি যায় না। জিলানী সন্ত্রাসে পাকিস্তানের মদত মানছে না। নাশকতাও চলবে, আবার মৈত্রী আলোচনাও চলবে, তা হয় না। ইসলামাবাদ সন্ত্রাস দমনে এখনো যত্নবান নয়। পাক বিজ্ঞানী খলিল চিস্তি আজমের জেলে বন্দী। হ্যাঁ, হলই বা বয়স ৮৫ বছর, সে ভারত বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। তার সাথে বা কাসভের সাথে সর্বজিতের তুলনা চলে না। যখন পাক রাষ্ট্রপতি জারদারি এলেন, তখনও দিল্লী ইসলামাবাদকে হাফিজ সঈদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ দেয়। এই হাফিজ ২৬/১১র হামলার মূল চক্রী। এই সমস্ত জঙ্গিদের সাথে ইসলামাবাদের সম্পর্ক মানতে হবে। এদের সাজা দিতে হবে। নির্দোষ সর্বজিৎকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়ে মুক্তি দিতে হবে। তবেই আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। জলিল আব্বাস জিলানীর একই কথা— "পাকিস্তান সরকারের সাথে মুম্বাই সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অপবাদকে আমি প্রবলভাবে খারিজ করছি।"

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী। বেলা একটার পর আজমের-গামী সব রাস্তার দায়িত্ব নেয় রাজস্থান পুলিশ। তিন হাজার রাজস্থান পুলিশ। দরগার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিল কয়েকশো কমান্ডো। ত্রিস্তর নিরাপত্তা বলয়। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দোকানপাট, অফিস, স্কুল কলেজ। বহুতল হোটেল ও আবাসনের বারান্দায় কাকপক্ষীরও বসার অনুমতি নেই। কোনো বহুতলের জানালা খোলার অনুমতি নেই। খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় আসছেন পাক রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি, পুত্র বিলাবল জারদারি সহ। এই দরগায় ২০০৩ সালে এসেছিলেন বেনজির ভুট্টো, কারাবাসে থাকা স্বামীর মুক্তি কামনায় মন্নত করেন। সেই মন্নত মঞ্জুর হয়। হবেই তো। মনস্কামনা পূরণই তো গরিবের হমদম খাজা সাহেবের বৈশিষ্ট্য।

পিসি এবং ভাইঝি, দলবীর আর স্বপ্নদীপ এক বুক আশা মনস্কাম নিয়ে খাজা সাহেবের শহরে আস্তানা গেড়েছে গত দুদিন যাবৎ। গরীব নওয়াজ খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি, এখানে কারো মনোরথ বিফল যায় না। সবাই এখানে মানত করে। খোদ প্রেসিডেন্ট জারদারির কাছে সর্বজিতের মুক্তির প্রার্থনা জানাতে এসেছিল দলবীর আর স্বপ্নদীপ। আশা নিরাশার দোলাচলে কেটেছিল পুরো দুটো দিন। শেষাবধি বিফল মনোরথ। দেখা করার অনুমতি মেলে নি। গরিবের নওয়াজের আশীর্বাদ মেলে নি। সর্বজিতের মুক্তিলাভ সেই তিমিরেই। সাবেক হুকুম বহাল। বহু প্রতীক্ষার অবশেষে...।

শেষাবধি বুঝি মনস্কাম পূর্ণ হতে চলেছে। আজ ২৮শে জুন, ২০১২ পাক জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেন এক ভারতীয় বন্দী। সাদা দাড়িতে সারা মুখ তার ঢাকা, বেল্টের সাথে লোহার চেন বাঁধা। সঙ্গে আছে পাক নিরাপত্তা রক্ষীরা। বন্দীকে নিয়ে আসা হল ওয়ার্ধা সীমান্তে। সীমান্তের এপারে অপেক্ষারত উৎসুক মুখের ভীড়। কারো চোখে বুঝি পলক পড়ে না। একটা মুহূর্তকেও হারাতে চায় না বুঝি। কিন্তু না, সর্বজিৎ মুক্তি পায় নি, মুক্তি পেয়েছে সুরজিৎ সিংহ, তিন দশক পর। পাক সংবাদমাধ্যম প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করেছে। অনিচ্ছাকৃত ভুল। বিভ্রান্তি কেন? উর্দুতে সুরজিৎ আর সর্বজিৎ উচ্চারণ প্রায় একই। সুরজিৎ ঘরে ফিরলো, সর্বজিৎ ঘরে ফেরে নি। সুরজিৎ-এর স্ত্রী হরবংশ, ছেলে কুলবিন্দর ও নাতি নাতনিরা আনন্দে উদ্বেল। বাবার জন্য অপেক্ষা করে কুলবিন্দরের এক ভাই গত হয়েছে। কুলবিন্দর বাবার মুখটা ভালোমতো মনে করতে পারে না। নাতি নাতনিদের মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু পরিবারে খুশির খামতি নেই।

এই খুশির মাত্রা দেখে অনুমান করতে পারা যায় বিপরীতে সর্বজিৎ-এর পরিবারে হতাশার আবহ।

মুক্তি পেয়ে সুরজিৎ জানালেন, কোট লাখপত জেলে বেশ ক'বার তার সাথে সর্বজিৎ-এর দেখা হয়েছে। সর্বজিৎ ভালোই আছে। পাক জেলে ভারতীয় বন্দীরা খুব খারাপ নেই, সে খবরও পাওয়া গেল। এ জানায় পিসি ভাইঝির কী আর লাভ!

দলবীর কাউর আর স্বপ্নদীপ কাউর, পিসি আর ভাইঝি সংবাদপত্র পড়ে উৎকণ্ঠিত ও হতাশও। সংবাদপত্রের শিরোনাম: ''আমি জানলামই না, গোপনেই ফাঁসি কাসভের''। ২১শে নভেম্বর, ২০১২ ভোররাতে ফাঁসি হলো আজমল কাসভের। নিদ্রাহীন পিসি-ভাইঝি। ফাঁসি নিয়ে সর্বজিৎ-এর পরিবার মন্তব্য করতে চাননি। উৎকণ্ঠা আশঙ্কার কারণও অছে। সংবাদপত্র লিখেছে, লোকসভা নির্বাচন এদেশে আর দেড় বছর বাকি। ''মাত্র ছমাস আগে কোমায় চলে যাওয়া একটা সরকার বিজেপিকে মোক্ষম চাপে ফেলে দিয়ে কংগ্রেস বুঝিয়ে দিল জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তারা বিজেপির চেয়ে পিছিয়ে নেই।'' খুব শীগগির লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করবে কংগ্রেস। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ট্রাম্প কার্ড ছিল অবশ্যই জাতীয়তাবাদ ও কাসভ ইস্যু। তার আগেই কংগ্রেস সরকারের ওভার ট্রাম্প। ''এটা পরিষ্কার যে, লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই একটি চিত্রনাট্য ধরে এগোচ্ছেন কংগ্রেস সভানেত্রী''। অন্য প্রতিবেদকের সংযোজন, ''যে ক্ষিপ্রতায় কাসভের মৃত্যুদণ্ড মকুবের আবেদন খারিজ করলেন প্রণববাবু তাতে স্পষ্ট যে সরকারের সাথে সব রকম সহযোগিতাই শুধু নয়, তিনি গোটা চিত্রনাট্যের শরিক। এমনকি ঠিক কোন সময়ে কাসভের ফাঁসি হবে সেই সময় নির্ধারণেও প্রণবের ভূমিকা রয়েছে।''

ঘুম আসে না। বিছানায় বসে ঘামতে থাকে, একটা ভেজা ভেজা শীতল স্রোত শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে আসে। একটা ফাঁসি, তা নিছক শাস্তি নয়, একটা গোটা 'চিত্রনাট্য'-র অঙ্গ। হামলা উপলক্ষ্য মাত্র, জঙ্গি... কথার কথা। সরকার সুস্থ অথবা কোমাচ্ছন্ন, বিরোধী দল জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্ম কোন তাস খেলবে সেটা অনুমান করা, সরকারি দলের সভানেত্রীর ওভারট্রাম্প... কত সমীকরণের পর চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যে বেহিসেবি হলে চলে না, আফজল গুরু নিয়েই সরকার কত হিসেবি পা ফেলেছে... ''কাশ্মীর রাজনীতির জটিলতা। আফজল ছিল সংসদ হামলায় যুক্ত, সে একজন কাশ্মীরী। ওর শাস্তি হলে কাশ্মীরে কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদও সংখ্যালঘু ভোট হারানোর ভয়ে আফজলের ফাঁসির আদেশের বিরোধিতা করে।'' স্বপ্নদীপ স্পষ্ট বুঝতে পারে জঙ্গি হামলা...মৃত্যু...রক্তপাত সবই মিথ্যা। আসল সত্য রাজনৈতিক চিত্রনাট্য। ক্ষমতায় আসীন হওয়া ও ক্ষমতায় কায়েম থাকার প্রয়াশ।

হঠাৎ বুঝি চিন্তার জট খুলে গেছে পিসি-ভাইঝির। এই রকম একটা 'চিত্রনাট্য' পাকিস্তান সরকারও রচনা করছে! ওদেশেও নির্বাচন আসন্ন, জারদারি সরকার কোমায় আছে। জয়ের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। সেনাবাহিনী-আইএসআই ও সন্ত্রাসবাদী-কট্টরপন্থীরা চাইবে কাসভের হত্যার শোধ নিতে সর্বজিৎকে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক। কোমাচ্ছন্ন জারদারি প্রশাসন এই চাপ উপেক্ষা করতে পারবে না। ''এই অবস্থায় সর্বজিৎকে মুক্তি দিতে গেলে দেশের সাধারণ মানুষের রোষের মুখে পড়তে হবে জারদারি সরকারকে।'' আচ্ছা! জারদারি যদি মনমোহন-সনিয়া-প্রণবের মতই কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের সুযোগ না দিয়ে আগেই সর্বজিৎকে... একই রকম চিত্রনাট্য...। না, এবার ভাবতে পারছে না। চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়।

যদি লিখতে পারতাম, তবে একটা গল্প হয়ে যেত। গল্পের পরিণতি মিলনান্তক নাকি বিয়োগান্তক হবে সে কথা জানেন আসিফ আলি জারদারি ও তার 'চিত্রনাট্য'। তবে গল্পের পরিণতি যাই হোক, কাহিনী মর্মস্পর্শী। সমস্যা হল নিন্দুকের হৃদয় নাই, তার মন নাই। তাই এই কাহিনীতে নিন্দুকের সংযোজন...। এক খাজা সাহেব তো মনস্কাম পূরণ করেন, তিনি কি পক্ষপাতদুষ্ট? জারদারি-মনমোহন-স্বপ্নদীপ কার মনস্কাম পূরণ করেন তিনি আমরা লক্ষ্য রাখবো। দুই, আজমের জেলে বন্দী পাক বিজ্ঞানী খলিল চিস্তির মুক্তি দাবি করেছেন তার কন্যা আমলা। স্বপ্নদীপ নাকি আমলার হয়ে খলিল চিস্তির মুক্তির আর্জি জানিয়েছে ভারত সরকারের কাছে। সর্বনাশ! আমলা যদি সর্বজিতের মুক্তি দাবি করে পাক প্রশাসনের কাছে! সর্বনাশ, ক্ষমতার চিত্রনাট্যের বাইরে অ-ক্ষমতার চিত্রনাট্য! দিল্লী ইসলামাবাদের কপালে বুঝি ভাঁজ। তাহলে! এটাকে কাউন্টার হেজিমনি বলা যাবে কি? তিন, সদ্য মুক্ত সুরজিৎ সিংহ বলেছেন, তাকে চরবৃত্তি করতেই পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। এর আগে পাক জেল থেকে মুক্ত কাশ্মীর সিংহ ও গোপাল দাসও চরবৃত্তির কথা একইভাবে স্বীকার করে। সুরজিৎ বলেন, তাকে চরবৃত্তি করতেই পাঠিয়েছিল ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র'। ভাবুন, ভারতেও হামজা-কাসভ! এসব বলে কি?

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো সূত্রবদ্ধ করেছিলাম, যদি কেউ একটা গল্প লেখেন, এই ভেবে। এখন দেখছি লেখার প্রয়োজন নেই। কারণ একটা গল্প মনে পড়ছে:

বিধবা আম্মি প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুকরিতে চানা আর মুমফলি নিয়ে সেনা ছাউনির বাইরের ফটকের আশে পাশে বেচতে যায়। সৈনিক ছোকরার দলকে ডেকে নিজের ছেলের কথা জানতে চায়। ছেলের খবর । ছোকরার দল পাত্তা দেয় না, বুড়ির কথায় কান দেয় না। নিঃসঙ্গ মায়ের পিছুটি পড়া চোখ। ছেলে তার সামরিক গুপ্তচর, প্রতিবেশী দেশের সেনাবাহিনীতে গোপনে মিশে আছে। জনে জনে শুধায় ছেলের খবর। কে দেবে খবর? শুধু একটি ছেলে নিঃসঙ্গ মায়ের পাশে বসে, গল্প করে, চানা খায় মুমফলি খায়। আসলে সেই ছেলে বুড়ির মধ্যে খুঁজে পায় নিজের আম্মিকে, এই বিদেশে স্পষ্ট দেখতে পায় তার স্বদেশে একাকী নিঃসঙ্গ আম্মিকে। সে নিজেও তো বিদেশে একাকী... নিঃসঙ্গ। মুছে যায় ভূগোলের গণ্ডী, দেশকালের সীমা, জাতীয়তাবাদ হার মানে নতুন চিত্রনাট্যের কাছে। শত্রুপুরীতে মিলে যায় মায়ের স্নেহ। শত্রুভূমি- মাতৃভূমি-স্বদেশ-বিদেশ একাকার।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

দীপংকরকে মনে পড়ে

মনিময় মুখোপাধ্যায়

দীপংকরের সঙ্গে নিত্য সংযোগ উনিশশো ষাট সাল থেকে বছর দশেকের বেশি নয়। কিন্তু গত তেপ্পান্ন বছর ধরেই ওর কথা উঠলে বন্ধু বলে উল্লেখ করি। এ রকমটাই ওর সজীব সঙ্গ। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে বহরমপুর থেকে বার্ণপুর চলে আসি। ষাট সালে বহরমপুরে ফিরে আসি বি.এ পড়তে। সেখানে আমাদের একটি অব্যবহৃত বাড়ি ছিল। তাছাড়া কৃষ্ণনাথ কলেজের নামডাক ছিল কলকাতার পড়েই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে আশ্রয় পায় গঙ্গার ধারের কলেজের এই সাহেবি ধরনের বাড়িতে।

কলেজের বাইরে বন্ধু হয় ভোলানাথ। সে দীপু বলতে অজ্ঞান। কাজেই ভোলা চাইছিল দীপংকরের সঙ্গে আমার দেখা হোক। সেই দীপংকর তখন হিন্দু হোস্টেলের আবাসিক। মৌলানা আজাদ কলেজে অর্থনীতির ছাত্র। কৈশোরে পিতৃহীন দীপংকর থাকতো ভাড়া বাড়িতে। তারা আদতে পূব-বাংলার। সেই সময়ে দীপংকরের সেজদা স্কুলের শিক্ষক। শেষ বিকেলে চুলে শাম্পু লাগিয়ে ফেনা মাথাতেই শুকোতে দিয়ে আলবেট কেটে চলে যেতেন গণনাট্য সংঘের কাজে। তাঁর গোঁসাই ঠাকুরের অভিনয় রাজাকে চাড়িয়ে যেত 'রক্তকবরী' নাটকে। কৈশোরে খেলার মাঠে আরএসএস-র কব্জায় পড়েছিলেন। তাদের কাজকর্মের নকশা দেখাতেন বড় হয়ে। "মন্ডলং কুরু! পেদানিং শুরু কুরু!" দীপংকরের মেজদা তখন ডাক বিভাগের কর্মী ও কলকাতার বাসিন্দা। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। তা তখনকার দিনে বেশ সাহসের কাজ ছিল। কম বয়সে তাঁর টি বি হয়েছিল। তখনকার দিনে কাউকে ক্ষয় রোগে ধরা মানে পারিবারিক বিপর্যয়। দীপংকরের বড়দা ছিলেন গোয়েন্দা। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দীপংকরের বিশেষ যোগাযোগ নজরে আসেনি।

গত শতকের '৬০-৬২ সালে বহরমপুরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলীতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বাড়ছিল। "ভাল ভাল ফ্যামিলির ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে" —এরকম খেদোক্তি শোনা যেত। এ প্রভাব বলয়ে এসেছিল দীপংকরদের পরিবার ও সে নিজে। ছাত্র দীপংকরের ঝোঁক ছিল বইপত্রে। বিশেষত কবিতা পড়ায়। সে নিজেও এক রকম কবিতা লিখত বলে মনে পড়ে। তাঁর অতি আগ্রহ ছিল বিতর্ক সভায়। ক্লাব, সংগঠন, পত্রিকা প্রকাশ এ সবে তার সহজ দক্ষতা ছিল। কিন্তু ছাত্র-রাজনীতি সে দূরে রাখত। আমাদের এ ব্যাপারে সক্রিয়তা তার অপছন্দ ছিল। কেরিয়ার তৈরি করাই তখন সে প্রথম কাজ মনে করত। অবশ্য তার কেরিয়ার বাসনা ছিল কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনা। তার পরিবারের লোক ও সেজদা চাইতেন সে আইএএস হোক। ঐ পরীক্ষার জন্য সে দরখাস্তও করেছিল। পরীক্ষার দিন দুয়েক আগে কলকাতা যাবে বলে রওনা হয়ে উল্টোদিকে লালগোলায় চলে আসে। তখন সেখানকার স্কুলে কয়েকমাস আমি পড়াচ্ছিলাম। স্কুলের স্বর্ণ বা হীরক জয়ন্তী চলছে। মজলিশ বসছে দেবব্রত বিশ্বাস-হেমাঙ্গ বিশ্বাসের। গ্রামে এই মাপের উৎসব হলে এক অসংগঠিত মেলা বসে যায়। দীপংকর মহা ফুর্তিতে উৎসবে যোগ দিল। পাশে পদ্মা আছে, দেবব্রত এসেছেন। কোমল গান্ধারে আর বাকি কী। গণনাট্যের টীমের সঙ্গে এলেন নির্মল চক্রবর্তী। ডেকে বললেন ভাইকে, তুই এখানে? চিরকেলে সুবক্তা দীপংকর জানত কখন বোঝা হতে হয়।

দীপংকর নিজের পয়সায় ও উদ্যোগে আমাকে এমএ-তে ভর্তি করেছিল। (পরীক্ষা দিয়েছিলাম অনেক বছর পর প্রাইভেটে) ঘোড়া সেবার জল খায়নি। যা হোক, এমএ ক্লাসের ছাত্র হওয়ার সুবাদে কলকাতা আসা গেল। কলেজস্ট্রীটের জ্যোতিষ্ক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রদীপ হয়ে থাকতে হয়েছিল। কিছু সময় পরেই যার তেল শেষ হয়ে যায়। আসল যেটা হল তা দীপংকরের নিত্য সান্নিধ্য। সে কলেজ শেষ করে ধোপদুরস্ত পোশাকে টিউশন পড়াতে যেত কলকাতার দূর দূরান্তে। ঐ উপার্জনেই তার খাওয়া-থাকা-পড়া। আশুতোষ বিল্ডিং-এ দু-তিনটি ক্লাস করে ক্যান্টিনে চলত বিকেল পর্যন্ত আসল কাজ। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের অজুহাতে ইউনিয়ন অফিস তখন তালা বন্ধ। বিকেল হলেই যেতাম হায়াৎ খাঁ লেনে দীপংকরের রেস্টকর্টে। তারপরে কলকাতার রাস্তায় দীর্ঘ ভ্রমণ। কখনও কখনও রাস্তায় কিছু কিনে খাওয়া হতো— যেমন কলেজস্ট্রীট বাজার থেকে মর্তমান কলা আর খেজুর গুড়ের পাটালি। রবিবার না হলে ভ্রমণ শেষ হত তার টিউশন বাড়ির কাছাকাছি। দীপংকরের চালচলনে বোঝাই যেত না কতটা আর্থিক অনিশ্চয়তা তার সঙ্গী ছিল। পরীক্ষার আগে মাস দুই একনাগাড়ে না পড়লে চলবে না। অথচ টিউশনে তো সবেতন ছুটি নেই। তাই বোর্ডিং ছেড়ে বেহালায় দু মাস আশ্রয় হলো আমাদের বাড়ি। আসার পিসিমার মাত্রাতিরিক্ত স্নেহে ঐ বাড়ির আশ্রয় আমার সব বন্ধুদের জন্য আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করতাম।

দীপংকর এর পরে সত্যিই কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপক হল। তার বন্ধুমহলের চলাফেরা রহনসহনও পাল্টে গেল। পুনশ্চ প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিশাল এক অফিস ঘর হল। তরুণ ও যুবকদের ভিড় হত সেখানে। দীপংকরের টানে সেখানে যারা আসত তাদের মধ্যে ছিল বর্তমান আজকাল সম্পাদক।

Unfiled Notes Page 39

তরুণীদের তখনও পাবলিকে আসার চল হয় নি। আমি কলকাতাতেই থেকে গেছি। একটা মজার চাকরিও জুটেছিল। প্রায়ই তাই বহরমপুর যেতে কোন অসুবিধা হত না। যেতেও হত পত্রিকা বা ফিল্ম ক্লাবের কাজে। ব্যারাকপুর ছাড়া কলকাতার বাইরে তখন বহরমপুরেই ছিল ফিল্ম ক্লাব। উদ্যোক্তা দীপংকর। কলকাতার দিকটা আমাকে দেখতে হতো। রাতের ট্রেনে রেলের লোকদের এড়িয়ে ফিল্মের ক্যান বয়ে নিয়ে যেতাম। আবার এই ফিল্ম ক্লাবের সৌজন্যেই রাজভবনে ফিল্ম আন্দোলনের প্রতিনিধি মন্ডলীতে বসে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে চা পানে যোগ দেওয়া গিয়েছিল। বিপ্লবী বুলিতে আমাদের তখন খৈ ফুটত কিন্তু ইন্দিরা সান্নিধ্যের মায়া আবিষ্ট করেছিল। এত নরম ও মিষ্টভাষী, মাখনমূর্তির মত এত সুন্দরী— এত সহজেই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সব দাবি মেনে নিলেন! বিস্ময়কর! এঁরই (নরম!) আমন্ত্রণে দীপংকরকে বছরখানেক সরকারি অতিথি হতে হয়েছিল পরে জরুরি অবস্থার সময়ে।

দু-চার দিনের জন্য তার বোর্ডিংবাসী বিপ্লব দাশগুপ্ত ও পরমেশ আচার্য্যের সঙ্গে সে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। পরমেশ আচার্য্যের সঙ্গে আমার বহুদিন যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদে তিনি পুনশ্চ'য় কবিতা লিখেছেন, একটু রসসিক্ত অবস্থায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পুনশ্চ অফিসে আড্ডা দিয়েছেন। দীপংকর তার ক্লাসের মাস্টারমশাই 'বিষ্ণু দে' দেখাতে তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। ''অন্বিষ্ট'' প্রকাশের সাথে সাথে সে কিনে ফেলে। একবার দীপংকর আর আমি বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি গিয়েছিলাম— শুধু অকারণ পুলকে। 'কঙ্কাবতী' আর 'চিল্কার' উৎসস্থল যদি দক্ষিণ কলকাতাতেই পাওয়া যায় তবে সে ভ্রমণে কে না যায়। আমি তো একবার সত্যজিৎ রায়ের বসার ঘরেও ঢুকে পড়েছিলাম। তবে দু-তিন মিনিটের মধ্যে বিদায় নেবার সুবুদ্ধি বজায় ছিল। যা হোক 'কবিতা ভবন' দেখার সুফল ফলেছিল— বহরমপুরের সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর পুনশ্চ কার্যালয়— সালোনের কাজ করত বইকি।

দীপংকরকে অধ্যাপনা করতে কৃষ্ণনাথ কলেজ যেতে হবে। তখনকার দিনে অধ্যাপনা মানে ধুতি পাঞ্জাবী। দূর রাস্তা। সাইকেল কিনে ফেলল সে। একদিনের ক্র্যাশ ট্রেনিং ভরসা। দুই বন্ধু দুই সাইকেলে সঙ্গে চলল। তারা যেন ঘোষণা করছে— ''লারনার-লারনার''। সে মজার টানে আমি অচিরেই লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরলাম। বেশ ক'বছর চাকরির পরেও ডিপিআই দপ্তর দীপংকরের চাকরি পাকা করছিল না। পরে ছেদ ঘোষণা করল। অজুহাত কমিউনিস্ট রাজনীতির ছোঁয়া। দীপংকর তখনও রাজনীতির ধারে কাছে নেই। কিন্তু নেকড়ের সংহিতা মতে তুই ঘোলা না করেলও তোর বাপ করেছে। বা তোর লোম সন্দেহজনক। যা হোক তখনও শিক্ষা জগতে মানুষ ছিলেন। কলেজের অতি বিনয়ী অধ্যক্ষ রামচন্দ্র পাল রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ওর চাকরি পাকা হল। এর পর বাঙ্গালি জীবনবৃত্তে আসে— ইয়ে। সব ঠিকঠাক ছিল। প্রকাশ্যে অঘোষিত বাগ্‌দান পর্যন্ত। জাত-পাত সব মিল। কিন্তু মেয়ের বাড়িতে আপত্তি— অতি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক। কাজেই ভয় লোকে বলবে জানা চেনা করে বিয়ে। ষাটের দশকে কলকাতার শিক্ষিত পরিবারেও এমন ছিল মানসিক ভাব। না পুরনো হিন্দু মহাকাব্যীয় বীরত্ব, না আধুনিক যুগল মিলন। যা হোক তাকে দস্তুরমত সালংকারা কন্যার পাণিগ্রহণ করতে হল, অগ্নিসাক্ষী রেখে এবং বহু দৃষ্ট মুখ আবার শুভ দৃষ্টিতে দেখতে হল। আমি সেবার ছিলাম পুরোদস্তুর সেই উৎসবে।

১৯৬৬'র খাদ্য আন্দোলনের সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক কাজে দীপংকরের আগ্রহ ছিল না। রুশ-চীন বিরোধ, '৬২-র সীমান্ত যুদ্ধ এসব তাকে আরও সরিয়ে দিয়েছিল। এই সময়টায় আমি খুব মাথা ঘামাতাম সক্রিয় রাজনীতি নিয়ে। দীপংকরের অরাজনৈতিক সাহিত্য চর্চায় থাকতাম। তাল থাকত তাকেও ভেড়ানোর। তবে কোথায় ভেড়াব? পার্টি ভাগাভাগিতে আমিও ছিলাম ঘর ছাড়া। কিন্তু '৬৮র পর থেকে কলকাতায় এক রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়া গিয়েছিল। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক, বয়স্ক শ্রমিক তাতে যুক্ত হন। ক্রমে দীপংকরও তাতে সামিল হয়। এখনও অনীক সম্পাদকমণ্ডলীতে আছে যে রতন খাসনবিশ, সেও এই গোষ্ঠীতে ছিল। এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রচারপত্রের সবটাই দীপংকর ঘাড়ে তুলে নেয়। সে সময় সম্পাদক দীপংকরের নামে প্রকাশিত হয়েছে— 'পুবের হাওয়া', 'দুনিয়ার মজদুর', 'অনীক' ইত্যাদি। এর লেখাপত্র কলকাতা থেকে গেলেও তা ছাপানো, সম্পাদনা করা এবং অর্থের যোগান ছিল দীপংকরের ভার। সে চমৎকার ভাবে কাজ করত।

পরে ব্যক্তিগত কারণে আমি ঐ গোষ্ঠী বা সব রকম রাজনৈতিক কাজ থেকে সরে যাই। দীপংকর ঐ গোষ্ঠীতে থেকে যায়। ঐ গোষ্ঠী নকশালবাদী রাজনীতিতে চলে যায়। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। হঠাৎ দেখা হলে রাজনীতি ছাড়া সব বিষয়ে কথা হতো। তবে ঐ গোষ্ঠীতেও অভ্যন্তরীণ বিরোধ সংঘর্ষ পর্যন্ত এগিয়ে ছিল। দীপংকর সে সময়ে খুব কড়া সমর্থক হয়েছিল সশস্ত্র রাজনীতির। নিজে অবশ্য সে একটি ইঁদুর মারতেও উৎসাহী ছিল না।

তার সঙ্গে শেষ দেখা হল ভোলানাথের হঠাৎ মারা যাওয়ার দিনে। আমিই তাকে খবর দিই। সঙ্গে সঙ্গে সে ভোলানাথের বাড়ি এসে পড়ে। বহু বহু সময় থেকে যায়। বাড়ি ফিরেই অনীক'এর পক্ষে কাউকে দিয়ে মালা পাঠায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ। ভোলানাথও এই সব পত্রিকার কাজে ছিল।

অনীক সম্পাদকের জন্য চৌকি পাতা থাকে পূব-পশ্চিম দুই বাংলায়, বাঙ্গালি বাস করে এমন বহু জায়গায়। আমার পক্ষে দরকার পড়লেই তরুণ সময়ের স্মৃতিঘন সান্নিধ্য যার কাছে পাওয়া যেতে পারত আমার বন্ধু সেই দীপংকর আর বেঁচে নেই। বাকি জীবন অবশ্যই সে আমার মনে থাকবে।